আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ

সংঘাতের মুখে ইসলাম

সংঘাতের মুখে ইসলাম

আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ
অনুবাদ ঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৯৭

৩য় প্রকাশ
শাবান ১৪৩০
শ্রাবণ ১৪১৬
জুলাই ২০০৯

বিনিময় ঃ ৯৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SANGHATER MUKHE ISLAM, Allama Muhammad Asad
Translated by Sayyed Abdul Mannan. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ইসলামের মুক্ত পন্থা ১১
পশ্চিমের ভাবধারা ২৬
ক্রুসেডেরপ্রতিচ্ছায়া ৪৪
শিক্ষা প্রসংগে ৫৭
পুরানুকরণপ্রসংগে ৬৯
হাদীস সুন্নাহ্ ৭৬
সুন্নাহ্রপ্রাণবন্তু ৮৮
উপসংহার ১০০

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ

বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে মানুষের ইতিহাসে আমাদের যুগের মতো এমন অশান্ত যুগ আর আসেনি কখনো। আমাদের সামনে আস্ছে এমন অসংখ্য সমস্যা, যার নতুন ও অভূতপূর্ব সমাধানের প্রয়োজন হচ্ছে। তা' ছাড়া যে দৃষ্টিভঙ্গিতে এইসব সমস্যা এসে হাযির হচ্ছে আমাদের সামনে, তা'ও এতোকালের অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। সব দেশেই সমাজে আসে মৌলিক পরিবর্তন। যে গতিতে এই সব পরিবর্তন ঘটে, প্রত্যেক দেশেই তার ধরণ আলাদা; কিন্তু প্রত্যেক জায়গায়ই আমরা সেই একই গতিশীল উদ্যম লক্ষ্য করি, যাতে বিরতি বা দ্বিধার অবকাশ থাকে না।

ইসলামী জাহানেও এ ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রম নেই। এখানেও পুরানো রীতি ও ধারণা লোপ পেয়ে যাচ্ছে, আর আত্মপ্রকাশ করছে নতুন নতুন রূপ। এই ক্রমবিকাশের পরিণতি কি? কতো গভীরে প্রবেশ করছে এ পরিবর্তন? ইসলামের সাংস্কৃতিক লক্ষ্যের সাথে কতোটা খাপ খাচ্ছে এসব ক্রমবিকাশ?

এর সবগুলো প্রশ্নের ব্যাপক জবাব এখানে দেওয়া সম্ভব হবে না। সীমাবদ্ধ স্থানের দরুন মুসলিম সমাজের সামনে হাযির সমস্যাগুলোর মধ্যে মাত্র একটির আলোচনা করা হবে এখানে। সেটি হচ্ছেঃ পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি মুসলিম জাহানের মনোভাব কেমন হওয়া দরকার। বিষয়টির ব্যাপক গুরুত্বের দরুন অবশ্য ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, বিশেষ করে সুন্নাহর নীতি সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা করা দরকার হবে। যে বিষয়ের আলোচনায় বহু বিরাট গ্রন্থ

www.pathagar.com

প্রণয়নের প্রয়োজন, তার আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের পক্ষে মোটামুটি ধারণা দেওয়ার বেশী কিছু করা অসম্ভব। তা' সত্ত্বেও-অথবা হয়তো সেই কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা অন্যান্য লোককে এই সর্বাধিক জরুরী বিষয়টির দিকে অধিকতর চিন্তা নিয়োগে উৎসাহিত করবে।

এখন আমার নিজের কথা বলছি,-কারণ কোনো নবদীক্ষিত মুসলমানের কথা বলতে গেলে মুসলমানদের জানবার অধিকার আছে, কেন সে ইসলাম কবুল করলো।

১৯২২ সালে কয়েকটি বিশিষ্ট ইউরোপীয় সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হিসাবে আফ্রিকা ও এশিয়া সফর করার জন্য আমি আমার স্বদেশ অষ্ট্রিয়া ছেড়ে রওয়ানা হই। তখন থেকে শুরু করে আমার প্রায় সবটা সময় কেটেছে ইসলামী প্রাচ্য দেশগুলোতে। যেসব জাতির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছিলো, নিছক বাইরের লোকেরই মতো। আমি আমার সামনে দেখতে পেলাম ইউরোপীয় থেকে আলাদা ধরনের এক সমাজবিধান ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি; এবং গোড়া থেকেই ইউরোপের ব্যস্ত সমস্ত যান্ত্রিক জীবন-পদ্ধতি তুলনায় অধিকতর শান্ত-সমাহিত তথা অধিকতর মানবোচিত জীবন-বিধানের প্রতি আমার মনে জাগলো একটা সহানুভূতির ভাব। এই সহানুভূতি আমায় ক্রমে ক্রমে এ বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করলো, এবং আমি মুসলিমদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে উঠলাম। এই সময়টায় সে মনোযোগ আমায় ইসলামের গন্ডির মধ্যে টেনে নেবার মতো বলিষ্ঠ ছিলো না, কিন্তু এর ফলে আমার সামনে এমন এক প্রগতিশীল মানব-সমাজের সম্ভবনার নতুন পথ খুলে গেলো-যা' ন্যূনতম আভ্যন্তরীণ সংঘাতও সর্বাধিক পরিমাণ খাঁটি ভ্রাতৃত্বের মনোভাব দ্বারা সুসংহত। আজকের দিনের মুসলিম জীবনের বাস্তব অবস্থা অবশ্য আমার কাছে মনে হলো ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষার দেয়া আদর্শ সম্ভাবনা থেকে বহু দূরে। ইসলামে যা কিছু ছিলো প্রগতি ও গতিচাঞ্চল্য, মুসলমানদের মধ্যে তা'

www.pathagar.com

পরিণত হয়েছে নিষ্ক্রিয়তা ও স্থবিরতায়; যা কিছু ছিলো মহত্ত ও আত্মত্যাগের প্রস্তুতি, বর্তমানের মুসলিম জীবনে তা নেমে গেছে সংকীর্ণ মানসিকতা ও সহজ জীবন যাপনের প্রতি লোভের পর্যায়ে।

এই তথ্যোদঘাটন দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সুস্পষ্ট অসামঞ্জস্যে হতভম্ব হয়ে আমি আমার সামনে উপস্থিত সমস্যাকে আরো ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবার চেষ্টা করলাম; মানে, আমি নিজকে ইসলামের গভির মধ্যে কল্পনা করবার চেষ্টা করলাম। এটা ছিলো নিছক বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত পরীক্ষার ব্যাপার; এবং এর ফলে অল্পকালের মধ্যে আমার কাছে সঠিক সমাধান ধরা পড়লো। আমি উপলব্ধি করলাম যে, মুসলিমদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পতনের একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, তারা ধীরে ধীরে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষার প্রাণবস্তুর অনুসরণে বিরত হয়েছে। ইসলাম এখনো রয়েছে; কিন্তু তা' হচ্ছে একটি প্রাণহীন দেহ। যেসব উপাদান একদা মুসলিম জাহানের শক্তির উৎস ছিলো, বর্তমানে তা'ই হচ্ছে তার দুর্বলতার কারণ; ইসলামী সমাজ শুরু থেকেই গড়ে ওঠেছিলো কেবল ধর্মীয় বুনিয়াদের ওপরে এবং আজ এই বুনিয়াদের দুর্বলতাই স্বাভাবিকভাবে তার সাংস্কৃতিক কাঠামোকে দুর্বল করেছে-এবং সম্ভবত পরিণামে তার ধ্বংসও এনে দিতে পারে।

ইসলামের শিক্ষা কতোটা মযবুত আর কতোটা বাস্তব, এ সত্য আমি যতো বেশী করে উপলব্ধি করতে লাগলাম, ততোই আমার মনে একটা জিজ্ঞাসা তীব্র হয়ে উঠতে লাগলো, কেন মুসলিমরা তাদের বাস্তব জীবনে এর পূর্ণ প্রয়োগে বিরত হলো। লিবিয়ার মরুভূমি থেকে পামির এবং বসফোরাস থেকে আরব সাগরের মধ্যবর্তী প্রায় সবগুলো দেশের চিন্তাশীল মুসলমানদের সঙ্গে আমি এ সমস্যার আলোচনা করেছি। ক্রমে সমস্যাটি আমার মনে দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কারের মতোই হয়ে উঠলো। এবং পরিণামে মুসলিম জাহান সম্পর্কে আমার বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত অন্যবিধ সকল চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। আমার অন্তরের জিজ্ঞাসা

www.pathagar.com

ধীরে ধীরে এমন বলিষ্ঠ হয়ে ওঠলো যে, অ-মুসলিম আমি মুসলিমদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করলাম, যেনো আমি তাদের অবহেলা ও নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে ইসলামকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আমার এ অগ্রগতি ছিলো আমার অনুভূতির বাইরে; অবশেষে একদিন ১৯২৫ সালের শরৎকালে আফগানিস্তানের পর্বত শ্রেণীর মধ্যে এক তরুণ প্রাদেশিক গবর্ণর আমায় বলে বসলেনঃ কিন্তু আপনি যে মুসলিম, তা কেবল আপনি নিজেই বুঝে ওঠতে পারছেন না। তাঁর কথাটি আমার অন্তরে বিঁধলো এবং আমি নীরব হয়ে থাকলাম। কিন্তু ১৯২৬ সালে যখন আমি আবার ইউরোপে ফিরে এলাম, তখন আমার মনে হলো যে, আমার মনোভাবের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পরিণাম হতে পারে ইসলাম কবুল করা।

মুসলিম হওয়া সম্পর্কে আমার বক্তব্য এ পর্যন্তই। তখন থেকে বারংবার আমার কাছে প্রশ্ন এসেছেঃ কেন আপনি ইসলাম কবুল করলেন? কোন জিনিষটি বিশেষ করে আপনাকে আকর্ষণ করেছিলো? এবং আমায় স্বীকারোক্তি করতেই হচ্ছে, আমি কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারছি না। কোনো বিশেষ শিক্ষাই আমায় আকর্ষণ করেনি, বরং সমগ্র আশ্চর্যজনক অবর্ণনীয়রূপে সুসংবদ্ধ নৈতিক শিক্ষার কাঠামো ও বাস্তব জীবনের কার্যসূচীই আমায় মুগ্ধ করেছিলো। এখনো আমি বলতে পারি না, কোন্ বৈশিষ্ট্যটি অপর কোন্‌টির তুলনায় আমার কাছে বেশী ভালো লাগে। আমার কাছে ইসলাম এক কুশলী স্থপতির পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টির মতো। এর সবগুলো অংশই পরস্পরকে পূর্ণ ও মযবুত করে তোলার জন্য হিসাব করে তৈরী; এতে নেই কোনো বাড়তি, নেই কোনো ঘাটতি; ফলে এর মাঝে রয়েছে পূর্ণ ভারসাম্য আর মযবুত স্থিরতা। ইসলামের শিক্ষা ও সত্যের প্রত্যেকটির যথাযোগ্য অবস্থানই সম্ভবতঃ আমার মনের ওপর বলিষ্ঠতম রেখাপাত করেছিলো। এর সাথে আরো অনেক ধারণা হয়তো ছিলো, কিন্তু আজ তা' বিশ্লেষণ করা আমার পক্ষে কঠিন। সর্বোপরি, এর ভিতরে ছিলো একটা প্রেমের

www.pathagar.com

ব্যাপারঃ আর প্রেম হচ্ছে অনেক কিছুর সংমিশ্রণ- আমাদের আকাংখা ও আমাদের নিঃসংগতা, আমাদের উচ্চ লক্ষ্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমাদের শক্তি ও দুর্বলতার সংমিশ্রণ। আমার বেলায়ও তা'ই ঘটেছিলো। রাত্রির অন্ধকারে গৃহে প্রবেশকারী দস্যুর ন্যায় ইসলাম অনুপ্রবেশ করেছিলো আমার মধ্যে; কিন্তু দস্যুর মতো পালিয়ে না গিয়ে সে থেকে গেলো চিরকালের জন্য।

তখন থেকে শুরু করে আমি ইসলাম সম্পর্কে যথাসাধ্য শিখবার চেষ্টা করেছি। আমি কুরআন শরীফ ও হযরত রসূলে করীম (সঃ)--এর হাদীস অধ্যয়ন করেছি, ইসলামের ভাষা ও ইতিহাস পাঠ করেছি এবং ইসলাম সম্পর্কে ও তার বিরুদ্ধে লিখিত রচনাসমূহ যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছি। আরব নবী যে মূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন, সে সম্পর্কে কতকটা অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমি পাঁচ বছরের অধিক সময় কাটিয়েছি নযদ ও হেজাযে-বিশেষ করে আল-মদীনায়। হেজায বহু দেশের মুসলিমদের এক মিলন কেন্দ্র; তাই সেখানে আমি বর্তমান যুগে ইসলামী জাহানে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক মতবাদের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ আমার মনে এই সুদৃঢ় ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, মুসলমানদের ত্রুটি বিচ্যুতির দরুণ পিছিয়ে পড়া সত্ত্বেও ইসলাম আত্মিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে আবহমান কাল ধরে মানব জাতির কাছে আগত গতিশীল সঞ্জীবনী শক্তির মধ্যে সর্বোত্তম; এবং এই সময় থেকেই আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ ইসলামের পূনর্জাগরণের সমস্যার চারদিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

এ আলোচনা সেই মহান লক্ষ্যের পথে আমার দীনি তোহ্‌ফা। এতে সম্পূর্ণ পরিস্থিতির নিরপেক্ষ বর্ণনার দাবী করা হচ্ছে না; এতে রয়েছে ইসলাম বনাম পশ্চিমী সভ্যতার বিরোধ সম্পর্কে আমার যবানবন্দী। এ আলোচনা তাঁদের জন্য নয়, যাঁদের কাছে ইসলাম মাত্র সমাজ জীবনের বহুবিধ কম-বেশী করে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্যতম, বরং এ হচ্ছে তাঁদেরই জন্য, যাঁদের অন্তরে এখনো প্রজ্জ্বলিত

www.pathagar.com

রয়েছে সেই অগ্নিশিখা, যা একদিন দগ্ধ করে সোনায় পরিণত করেছিলো হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর আস্‌হাবে কেরামকে; যে অগ্নিশিখা সমাজ-বিধান ও সাংস্কৃতিক অবদান হিসাবে ইসলামকে মহান করে তুলেছিলো একদিন।

www.pathagar.com

ইসলামের মুক্ত পন্থা

বর্তমান যুগের চলতি শ্লোগানসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে 'মহাশূন্য-বিজয়' (Conquest of Space)। আগেকার লোকেরা ভাবতেও পারতো না, এমনি সব যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে; এবং এইসব পথ ধরে মানব ইতিহাসে অভূতপূর্ব দ্রুত গতিতে ও ব্যাপকভাবে পণ্য চলাচল হচ্ছে। এই পরিস্থিতির ফল হয়েছে বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা। কোনো একটি জাতি বা দল আজ বাকী দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারে না। অর্থনৈতিক অগ্রগতি স্থানের সীমানা অতিক্রম করে গেছে। তার প্রকৃতি হয়ে ওঠেছে বিশ্বব্যাপক। প্রবণতার দিক দিয়ে তা' রাজনৈতিক সীমারেখা ও ভৌগোলিক দূরত্বকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যার বস্তুবাদী দিক থেকেও সম্ভবতঃ বেশী জরুরী দিক হচ্ছে এই যে, এর সাথে সাথে কেবল পণ্যের স্থানান্তরই হচ্ছে না, বরং চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেরও স্থানান্তর হচ্ছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি পাশাপাশি চললেও তাদের চলমান বিধির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থনীতির প্রাথমিক বিধান অনুযায়ী জাতিসমূহের মধ্যে পণ্য বিনিময় পারস্পরিক হয়ে থাকে; তার মানে, কোনো বিশেষ জাতি বরাবরের জন্য ক্রেতা এবং অপর জাতি বিক্রেতা হতে পারে না; পরিণামে প্রত্যেক জাতিকে একই সময়ে প্রত্যক্ষভাবে অথবা অপরের মাধ্যমে অর্থনীতি ক্ষেত্রে দেয়া-নেয়ার উভয় ভূমিকা অভিনয় করতে হবেই। কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিনিময়ের এ কঠোর বিধি অনুসরণের প্রয়োজন অনুভূত হয় না, অন্ততঃ তেমন কোনো প্রয়োজন দৃশ্যমান হয় না; এর মানে, ধারণা ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের স্থানান্তর যে আদান-প্রদানের ভিত্তিতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। এটা মানব -প্রকৃতির শামিল যে, যেসব জাতি ও সভ্যতা রাজনৈতিক ও

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অধিকতর বলিষ্ঠ মোহ বিস্তার করে এবং নিজেরা প্রভাবিত না হয়ে বুদ্ধিবৃত্তি ও সামাজিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। পশ্চিমী ও মুসলিম জাহানের জাতিসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আজ অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভংগিতে বর্তমানে মুসলিম জাহানের ওপর পশ্চিমী সভ্যতার যে বলিষ্ট একদেশদর্শী প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে, তাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই; কেননা, এ হচ্ছে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিণতি এবং এর সাদৃশ্য অন্যত্রও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এতে খুশি হলেও আমাদের জন্য সমস্যাটি অমীসাংসিত থেকে যায়। আমরা যারা কেবল নিরপেক্ষ দর্শকই নই, বরং এই নাট্যাভিনয়ের অতি বাস্তব অভিনেতাঃ- যারা নিজেদেরকে মনে করি হযরত রাসূলে করীম মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)- এর উম্মত হিসাবে, তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে এখানেই সমস্যার শুরু। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাঠামোর সাথে খাপ খাইয়ে নেবার মতো নিছক মানসিক প্রবণতা মাত্র নয়, বরং ইসলাম হচ্ছে সাংস্কৃতির এক স্বয়ংসম্পূর্ণ কক্ষ এবং সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক সমাজ বিধান। আজকের দিনের মতো যখন কোনো বিদেশী সভ্যতার দীপ্তি আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক গঠনে কোনো রকম পরিবর্তন ঘটায়, তখন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে, সেই বিদেশী প্রভাব আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সম্ভাবনার অনুকূলে, না তার বিরোধী; ইসলামী তমদ্দুনের ক্রমবিকাশে তা সহায়ক হবে, না বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

কেবল বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতে পারে। ইসলামী ও আধুনিক পাশ্চাত্য উভয় সভ্যতার মূল চালক-শক্তি (Motive forces) আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এবং অনুসন্ধান করতে হবে, তাদের মধ্যে কতোটা সহযোগিতা সম্ভব। যেহেতু

www.pathagar.com

ইসলামী সভ্যতা অপরিহার্যরূপে ধর্মীয়, তাই আমাদেরকে সবার আগে মানব জীবনে ধর্মের স্থান নির্ধারণের চেষ্টা করতে হবে।

আমরা যাকে 'ধর্মীয় মনোভাব' বলি, তা হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিগত ও জীবতাত্ত্বিক গঠনের স্বাভাবিক পরিণতি। মানুষ নিজকে জীবন রহস্য, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য এবং অসীমত্ব ও অনন্তকালের রহস্য বুঝাতে অক্ষম। তার যুক্তি ক্ষমতা দুর্ভেদ্য প্রাচীরে প্রতিহত হয়। সুতরাং সে মাত্র দুটি কার্য করতে পারে। এক হচ্ছে সমগ্রভাবে জীবনকে বুঝবার সকল চেষ্টা ত্যাগ করা। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ নির্ভর করবে কেবল তার বাইরের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যের ওপর এবং তারই ভিতর তার সিদ্ধান্ত সীমাবদ্ধ করবে। এইভাবে সে জীবনের একটি মাত্র ভগ্নাংশকে উপলব্ধি করতে পারবে-যা' প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির অনুপাতে সংখ্যা ও স্বচ্ছতার দিক দিয়ে দ্রুত বা ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে; কিন্তু তা' সত্ত্বেও তা' সব সময়ে সেই ভগ্নাংশই থাকবে এবং 'সামগ্র্যে'র উপলব্ধি থাকবে মানবীয় যুক্তির পদ্ধতিগত প্রয়োগ-ক্ষমতার বাইরে। এই পথেই চলছে প্রকৃতি বিজ্ঞান। অপর যে সম্ভাবনা বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার পাশাপাশি চলতে পারে, তা হচ্ছে ধর্মের পথ। এতে মানুষকে আত্মিক এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সহজাত অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনের একাত্মক ব্যাখ্যার স্বীকৃতির দিকে চালিত করে। সাধারণভাবে তার মূলে থাকে এই ধারণা যে, সর্বোপরি এমন এক সৃষ্টিধর্মী শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে, যা মানব জ্ঞানের অতীত কোনো পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র বিশ্বজগতকে পরিচালনা করছে। যে ধারণার কথা এখানে বলা হলো তা মানুষকে জীবনের বাহ্যতঃ দৃশ্যমান তথ্য ও অংশ সম্পর্কে অনুসন্ধানে বাধা দেয় না। বাইরের (বৈজ্ঞানিক ও ভিতরের (ধর্মীয়) ধারণার মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। বরং অস্তিত্ব ও চালক শক্তির (motve power) সমন্বয় হিসাবে, সোজা কথায় ভারসাম্যযুক্ত সুসমঞ্জস 'সামগ্র্য' হিসাবে সকল জীবনকে উপলব্ধি করার একমাত্র চিন্তামূলক সম্ভাবনা এই শেষোক্ত ধারণাতেই নিহিত রয়েছে। 'সুসমঞ্জস' (harmonious)

www.pathagar.com

কথাটি ভয়ানক অপ প্রয়োগ হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কথাটি দ্বারা মানুষের নিজের মধ্যে অনুরূপ মনোভঙ্গী বুঝায়। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি জানেন যে, তাঁর আশেপাশে ও নিজের মধ্যে যা কিছু ঘটছে, তা' কখনো কোনো শক্তির চেতনা ও উদ্দেশ্য বর্জিত অন্ধ খেলার ফল হতে পারে না; তাঁর বিশ্বাস, এর সব কিছুই একমাত্র আল্লাহর সচেতন ইচ্ছার পরিণতি এবং সেই কারণে মৌলিকভাবে বিশ্বজনীন পরিকল্পনারই অংশ। এমনি করেই মানুষ মানবাত্মা এবং প্রকৃতি নামে অভিহিত ঘটনাপ্রবাহ ও দৃশ্যময় বাহ্য পৃথিবীর মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের সমাধান করতে সক্ষম হয়। আত্মার সর্বপ্রকার যান্ত্রিক গঠন, সকল আকাংখা ও ভীতি, অনুভূতি ও কল্পনাজাত অনিশ্চয়তা নিয়ে মানুষ মোকাবিলা করে সেই প্রকৃতির–যার ভিতরে প্রাচুর্য ও নির্মমতা, বিপদ ও নিরাপত্তার সংমিশ্রণ হয়েছে বিচিত্র অবর্ণনীয় পন্থায়, এবং যা স্পষ্টতঃ মানব–মনের পদ্ধতি ও কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় কাজ করে যাচ্ছে। নিছক বুদ্ধিবৃত্তিজাত দর্শন বা ভূয়োদর্শন সঞ্জাত বিজ্ঞান কখনো এ দ্বন্দ্বের সমাধান করতে সক্ষম হয়নি। আজ ঠিক এই পথ দিয়েই ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ধর্মীয় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে মানবের স্বয়ং সচেতন আত্মা এবং মূক ও আপাতঃ দায়িত্ব বর্জিত প্রকৃতি আনীত হয়েছে এক আত্মিক ঐক্যের সম্পর্কে; কারণ মানুষের ব্যক্তিগত চেতনা এবং তার চারদিকে ও তার ভিতরে পরিব্যাপ্ত প্রকৃতি স্বতন্ত্র হলেও উভয়ই এক অভিন্ন সৃষ্টিধর্মী ইচ্ছার সুসংহত প্রকাশ এমনি করে ধর্ম মানুষকে যে, অজস্র কল্যাণ দান করেছে, তা হচ্ছে এই উপলব্ধি যে, সে হচ্ছে সৃষ্টির চিরন্তন গতিপ্রবাহের এক সুপরিকল্পিত অংশ; বিশ্বজগতের পরিণতির অসীম সংগঠনের একটি নির্দিষ্ট অংশ এবং কখনো সে তা না হয়ে পারে না। এই ধারণার মনস্তাত্বিক পরিণাম আত্মিক নিরাপত্তার ভারসাম্য বিধান করে এবং এতেই সূচিত হয় ধর্মবিমুখ থেকে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির পার্থক্য; তা সে যে ধর্মই অনুসরণ করুক না কেন।

www.pathagar.com

প্রধান প্রধান ধর্ম বিধানসমূহের নির্দিষ্ট মতবাদ যাই হোক না কেন, তাদর মৌলিক অবস্থা সাধারণ। মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রকাশ্য ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের আবেদন সব ধর্মেই সমভাবে বিদ্যমান। কিন্তু ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই বাচনিক বিশ্লেষণ ও নির্দেশ দানের বাইরে তার কার্যক্রম বিস্তার করে। এতে আমাদেরকে কেবল এই শিক্ষাই দেয় না যে, সমগ্র জীবন এক অপরিহার্য ঐক্য–কারণ আল্লাহর একত্ব থেকেই এর উদ্ভব,–বরং এতে আমাদেরকে সেই বাস্তব পন্থাও দেখিয়ে দেয়,–কি করে আমাদের প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিগত পার্থিব জীবনের সীমানার মধ্যে তার অস্তিত্ব ও চেতনার ভিতরে ধারণা ও কর্মের ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সর্বোপরি জীবনের এই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলামের কোনো মানুষ দুনিয়াকে অস্বীকার করতে বাধ্য হয় না; আত্মিক পবিত্রতার গোপন দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য কোনো কৃচ্ছ্র–সাধনের প্রয়োজন হয় না; আত্মার মুক্তির উদ্দেশ্যে ধারণা–শক্তির অতীত কোনো মতবাদে বিশ্বাস করার জন্য মনের ওপর চাপ পড়ে না। এই সব জিনিস সম্পূর্ণরূপে ইসলামের বহির্ভূত, কারণ ইসলাম একটি ভাববাদী মতবাদ অথবা দর্শন নয়। এ হচ্ছে সোজাসুজি আল্লাহর সৃষ্টির জন্য তাঁরই নির্ধারিত প্রকৃতির বিধি অনুসারে জীবনের একটি কর্মসূচী এবং এর সর্বোত্তম লক্ষ্য হচ্ছে মানব জীবনের আত্মিক ও বাস্তব দিকের পূর্ণ সমন্বয় বিধান। ইসলামের শিক্ষায় মানুষের দৈহিক ও নৈতিক অস্তিত্বের মধ্যে কোনোরূপ আভ্যন্তরীণ সংঘাতের অবকাশ না রেখে কেবল উভয় দিকের মধ্যে পারস্পরিক আপোস বিধানই করা হয়নি বরং জীবনের স্বাভাবিক বুনিয়াদ হিসাবে তাদের সহ–অবস্থান ও অবিচ্ছেদ্যতার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমার মনে হয়, এ কারণেই ইসলামী ইবাদাতের বিচিত্ররূপের মধ্যে মানসিক একাগ্রতা ও বিশেষ অংগ–ভঙ্গির পারস্পরিক সমন্বয় বিধান করা হয়েছে। ইসলাম বিরোধী সমালোচকরা কখনো কখনো প্রার্থনার এই বিশেষ ধরণকে তাদের অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে পেশ করে বলে থাকেন যে, ইসলাম আনুষ্ঠানিকতা ও বাইরের প্রদর্শনীর ধর্ম। গোয়ালা যেমন করে দুধ

www.pathagar.com

মাখন আলাদা করে ফেলে, তেমনি করে অন্য ধর্মের যেসব লোকেরা 'আত্মিক' থেকে 'দৈহিক' দিককে পরিষ্কার আলাদা করে দেখতে অভ্যস্ত, তারা খুব সহজে বিশ্বাস করতে পারে না যে, ইসলামের অন্তর্নিহিত দুটো এই উভয় দিক নিজ নিজ গঠনের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র হলেও পরস্পর সুসামঞ্জস্যভাবে বিরাজ ও আত্মপ্রকাশ করছে। অন্য কথায় ইসলামী প্রার্থনায় মানসিক একাগ্রতা ও দৈহিক অংগ-ভঙ্গির একত্র-সমাবেশ হয়েছে, কারণ, মানব জীবনের গঠনও ঠিক অনুরূপ এবং আরো ধারণা করা হয় যে, আমরা আল্লাহ প্রদত্ত সর্ববিধ শক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমেই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবো।

এই মনোভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই, তওয়াফ অনুষ্ঠানের মধ্যে। তওয়াফ মানে মক্কায় কাবা শরীফ প্রদক্ষিণ করা। যেহেতু পবিত্র নগরীতে প্রবেশকারী হাজীদের জন্য কাবা শরীফের চারদিকে সাতবার ঘুরে আসা বাধ্যতামূলক এবং মক্কায় হজ্বব্রত উদযাপনের তিনটি অপরিহার্য কর্তব্যের মধ্যে এ অনুষ্ঠানটি অন্যতম সেই কারণেই আমাদের মধ্যে এ জিজ্ঞাসা জাগা স্বাভাবিকঃ এর অর্থ কি? এমনি আনুষ্ঠানিক পন্থায় ভক্তি প্রকাশ করা কি প্রয়োজনীয়?

এর জবাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একটি বিশেষ বস্তুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করে আমরা তাকে আমাদের কর্মের কেন্দ্রবস্তু হিসাবে প্রতিষ্ঠা করি। যে কাবা শরীফের দিকে প্রত্যেক মুসলিম নামাযের সময়ে তার মুখ ফিরায়, তা আল্লাহর একত্বের প্রতীক হিসাবেই গণ্য হয়। তওয়াফে হাজীর দৈহিক অংগ চালনা মানব জীবনে কর্মের প্রতীক। সুতরাং তওয়াফের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কেবল আমাদের ভক্তিমূলক চিন্তায় নয়, বরং আমাদের বাস্তব জীবনে, আমাদের কর্মে ও প্রচেষ্টায় আল্লাহ ও তাঁর একত্বের ধারণা কেন্দ্রবস্তু হিসাবে থাকবে, কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে মজীদে বলেছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ـ

www.pathagar.com

"আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল এই জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।" (সূরা ৫১ঃ ৫৬)

সুতরাং এই 'ইবাদাত' বা উপাসনার ধারণা ইসলামে অন্য ধর্ম থেকে আলাদা। এখানে তা' কেবল নামায বা রোযার মতো ভক্তিমূলক কার্যকলাপেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার প্রসার হচ্ছে মানুষের বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে। যদি সমগ্রভাবে আমাদের জীবনের লক্ষ্য হয় আল্লাহর ইবাদাত, তাহলে আমাদের জীবনকে এর সকল দিকের সমন্বয়ে স্বাভাবিকভাবেই এক জটিল নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এমনি করে আমাদের জীবনের তুচ্ছতম কাজগুলো সহ সব রকম কাজকেই আল্লাহর ইবাদাত হিসাবে সম্পন্ন করতে হবেঃ অর্থাৎ আমাদেরকে তা করতে হবে আল্লাহর বিশ্বজনীন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সচেতনভাবে। এই ধরনের কার্যক্রম সাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের কাছে মনে হবে একটি সুদূর আদর্শ; কিন্তু আদর্শকে বাস্তব অস্তিত্বে রূপান্তরিত করাই কি ধর্মের উদ্দেশ্য নয়?

এদিক দিয়ে ইসলামের মর্যাদা অভ্রান্ত। প্রথমতঃ ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, মানব জীবনের বহুমুখী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে আল্লাহর স্থায়ী ইবাদাতই হচ্ছে এই জীবনের অর্থ, দ্বিতীয়তঃ এই লক্ষ্য অর্জন করা ততোক্ষণ পর্যন্ত অসম্ভব, যতোক্ষণ আমরা আমাদের জীবনকে আত্মিক ও বাস্তব–দু'ভাগে বিভক্ত করি; আমাদের চেতনায় ও আমাদের কর্মে এই উভয় দিকের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে এক সুসামঞ্জস্য সত্তা। আমাদের অন্তরে আল্লাহর একত্বের ধারণার প্রতিফলন হবে আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের সমন্বয় ও ঐক্য বিধানের প্রচেষ্টার ভিতরে।

এই মনোভাবের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হচ্ছে ইসলাম ও অন্যান্য পরিচিত ধর্মপদ্ধতির মধ্যে অধিকতর বৈষম্য সৃষ্টি। এই বৈষম্যের সন্ধান পাওয়া যায় এই সত্যের মধ্যে যে, শিক্ষা হিসাবে ইসলাম কেবল মানুষ

www.pathagar.com

ও তার স্রষ্টার মধ্যে দার্শনিক সম্পর্ক বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাতে সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয় ব্যক্তি ও তার সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যকার পার্থিব সম্পর্কের ওপর। পার্থিব জীবনকে শূন্যগর্ভ শক্তি–পরবর্তী আখেরাতের জীবনের অর্থহীন প্রতিচ্ছায়া মনে করা হয় না; বরং তাকে মনে করা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ অনন্যসাপেক্ষ সত্তা হিসাবে। আল্লাহ নিজে আহাদ বা একক কেবল অস্তিত্বে নয়, উদ্দেশ্যেও; সুতরাং তাঁর সৃষ্টিও একক, সম্ভবতঃ অস্তিত্বের দিক দিয়েও; উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তো বটেই।

আল্লাহর ইবাদাতের যে ব্যাপক ধারণার বিশ্লেষণ ওপরে করা হলো, ইসলামে তাই হলো মানব জীবনের তাৎপর্য। এই ধারণাই ব্যক্তিগত পার্থিব জীবনে মানুষের পূর্ণতায় পৌঁছবার সম্ভাবনার পথ প্রদর্শন করে। সকল ধর্মীয় পদ্ধতির মধ্যে একমাত্র ইসলামই ঘোষণা করে যে, পার্থিব অস্তিত্বে মানুষের ব্যক্তিগত পূর্ণতা লাভ সম্ভব। খৃষ্ট ধর্মের শিক্ষার ন্যায় ইসলাম তথাকথিত 'দৈহিক' কামনার নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধির পথ রুদ্ধ করে না; অথবা হিন্দু ধর্মের মতো ক্রমাগত উচ্চতর পর্যায়ে জন্মান্তরের প্রতিশ্রুতি দেয় না; অথবা বৌদ্ধ ধর্মের সাথেও ইসলাম একমত নয়, যেখানে কেবল ব্যক্তিগত আত্মার নির্বান ও পৃথিবীর সাথে তার মানসিক আবেগ প্রধান সংযোগের পরিসমাপ্তির মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ ও মুক্তি অর্জন সম্ভব হতে পারে। না–ইসলাম বলিষ্ঠ স্বীকৃতি দান করে যে, মানুষ তার পার্থিব ব্যক্তিগত জীবনে তার যাবতীয় পার্থিব সম্ভাবনার পূর্ণ প্রয়োগ দ্বারাই পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে।

ভ্রান্তিমূলক ধারণা এড়াবার জন্য 'পূর্ণতা' কথাটি যে অর্থে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে, তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যতোক্ষণ আমরা জীবতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধ মানব সম্পর্কে আলোচনা করি, সম্ভবতঃ ততোক্ষণ আমরা 'অবিমিশ্র' (absolute) পূর্ণতার ধারণা বিবেচনা করতে পারি না; কারণ যা কিছু অবিমিশ্র, তা' কেবল খোদায়ী গুণের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মানবীয় পূর্ণতার সত্যিকার মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক ধারণার আপেক্ষিক ও নিছক ব্যক্তিগত তাৎপর্য থাকবেই। এতে সর্বপ্রকার চিন্তনীয় গুনরাজির অধিকার, অথবা এমন কি, ক্রমাগত বাইরের নতুন নতুন গুণের অধিকার অর্জন বুঝায় না; বরং ব্যক্তির ভিতরে ইতিমধ্যেই যে সব গুণের অস্তিত্ব রয়েছে, কেবলমাত্র তারই পূর্ণ বিকাশ বুঝায়–যাতে করে তার অন্তর্নিহিত ঘুমন্ত শক্তিসমূহের জাগরণ সম্ভব হয়। জীব প্রকৃতির বিভিন্নতা হেতু প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সহজাত গুণেরও বৈষম্য আছে। সুতরাং এরূপ অনুমান করা অমূলক যে, সকল মানুষই এক ধরনের 'পূর্ণতা' লাভ করবে বা করতে পারবে,– যেমন অমূলক একটি পূর্ণগুণ সম্পন্ন দৌড়ের ঘোড়া ও একটি পূর্ণগুণ সম্পন্ন ভারবাহী ঘোড়ার মধ্যে ঠিক একই ধরনের গুণের প্রত্যাশা করা। উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে পরিপূর্ণ ও সন্তোষজনক হতে পারে; কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে, কারণ তাদের মূল স্বভাবে পার্থক্য রয়েছে। মানুষের বেলায়ও সেই একই ব্যাপার। পূর্ণতা যদি একটি বিশেষ 'ধরনের' মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হয়, যেমন খৃষ্টধর্মে কঠোরব্রতী সিদ্ধপুরুষ ধরনের লোককেই ধরা হয়ে থাকে, তা' হলে মানুষকে তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বর্জন, পরিবর্তন অথবা দমন করতে হবে। কিন্তু এর ফলে এই দুনিয়ার সকল জীবনের নিয়ন্তা, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের খোদায়ী কানুনকে সুস্পষ্টভাবে অমান্য করা হবে। সুতরাং ইসলাম দমননীতির ধর্ম নয় বলেই মানুষকে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্তিত্বে এতোটা সুযোগ দান করে, যাতে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রবণতা অনুসারে তার বিভিন্ন প্রকার গুণ, প্রকৃতি ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবৃত্তির সুনির্দিষ্ট বিকাশ সম্ভব হতে পারে। এমনি করে কোনো ব্যক্তি কঠোরব্রতী সাধকও হতে পারে অথবা আইনের গন্ডির মধ্যে থেকে তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্ভাবনাকে পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করতেও পারে; সে হতে পারে মরুচারী বেদুইন–যার আগামী কালের খাদ্যের সংস্থান নেই, অথবা চারদিকে পণ্য পরিবেষ্টিত সম্পদশালী ব্যবসায়ী। যতোদিন সে আন্তরিকতা ও চেতনা সহকারে

www.pathagar.com

আল্লাহর বিধানের কাছে নতি স্বীকার করে, ততোদিন তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে যে কোনো ধারায় তার ব্যক্তিগত জীবনের রূপায়ণ করবার স্বাধীনতা থাকবে। তার কর্তব্য হচ্ছে নিজকে সব চাইতে ভালো করে গড়ে তোলা, যাতে সে তার জীবনে স্রষ্টার প্রদত্ত কল্যাণকর দানের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে এবং নিজস্ব জীবনের পূর্ণ বিকাশ সাধন দ্বারা তার চারদিকের সকল মানুষের আত্মিক, সামাজিক ও বাস্তব সর্ববিধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনের রূপ কোনো বিশেষ মান দ্বারা নির্ধারিত নয়। তার সামনে যে অসংখ্য অন্তহীন বিধানসংগত সম্ভাবনার পথ খোলা রয়েছে, তার ভিতরে যে কোনো পথ নির্বাচনের স্বাধীনতা তার আছে।

ইসলামের এ 'উদার নৈতিকতার' (Liberalism) ভিত্তি হচ্ছে এ ধারণা যে, মানুষের মূল প্রকৃতি অপরিহার্যরূপে সৎ। খৃষ্টধর্মের ধারণা অনুসারে যেমন মানুষ পাপী হয়েই জন্মে, অথবা হিন্দু ধর্মের শিক্ষা অনুসারে সে যেমন মৌলিক দিক দিয়েই নীচ ও অপবিত্র এবং পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌছবার জন্য তাকে ক্রমাগত বেদনাদায়ক জন্মান্তরের পথ অতিক্রম করতে হয়, ইসলামে তার বিপরীত মত প্রকাশ করা হয় যে, মানুষ জন্মগ্রহণ করে পবিত্র হয়ে এবং তার ভিতরে থাকে পূর্ণতার সম্ভাবনা। কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ـ

"নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করি সর্বোত্তম উপাদানে।"

কিন্তু তার পরক্ষণেই আয়াতে বলা হয়েছেঃ

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ ـ

"এবং পরে আমরা তাকে নীচ থেকে নীচতম পর্যায়ে আনয়ন করি, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে ব্যতীত।" (সূরা ৯৫ঃ ৪, ৫)

www.pathagar.com

এই আয়াতে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, মূলের দিক দিয়ে মানুষ সৎ ও পবিত্র; এবং আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাস ও সৎকর্মের অভাব তার মৌলিক পূর্ণতা ক্ষুন্ন করে। পক্ষান্তরে, মানুষ যদি আল্লাহর একত্ব সচেতনভাবে উপলব্ধি করে এবং তাঁর কানুনের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তা' হলে সে তার মৌলিক ব্যক্তিগত পূর্ণতা রক্ষণ করতে অথবা পুনরায় অর্জন করতে পারে। এমনি ক'রে যা' কিছু মন্দ তা' ইসলামে অপরিহার্য নয়, এমন কি মৌলিকও নয়; তা' হচ্ছে মানুষের পরবর্তী জীবনের অর্জিত এবং তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রদত্ত সহজাত নির্দিষ্ট গুণের অপব্যবহার। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ গুণ সমূহ স্বতন্ত্র, কিন্তু সম্ভাবনার দিক দিয়ে তা' সর্বদা স্বয়ংসম্পূর্ণ; এবং দুনিয়ায় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাদের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। আমরা স্বীকার ক'রে নেই যে, চিন্তা ও অনুভূতির সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অবস্থার দরুন মৃত্যুর পরবর্তী জীবন আমাদেরকে এনে দেবে অন্যবিধ সম্পূর্ণ নতুন গুণ ও শক্তি, যাতে করে আরো বেশী করে মানবাত্মার অগ্রগতি সম্ভব হবে; কিন্তু এ হচ্ছে কেবল আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কিত ব্যাপার। ইসলামী শিক্ষায় আমরা নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাই যে, এই পার্থিব জীবনেও আমাদের প্রত্যেকেই পরিপূর্ণ মাত্রায় পূর্ণতার অধিকারী হতে পারি, যদি আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের উপাদান সমূহের পূর্ণ বিকাশ সাধন করি।

সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই মূহূর্তের জন্য আত্মিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ব্যাহত না ক'রে মানুষের জন্য পার্থিব জীবনকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করার সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। খৃষ্টীয় ধারণা থেকে এ ধারণা কতো বেশী স্বতন্ত্র! খৃষ্টীয় ধর্মমত অনুসারে মানবজাতি আদম ও হাওয়ার কৃত অপরাধের উত্তরাধিকার বহন করে হোঁচট খাচ্ছে এবং তার পরিণামে সমগ্র জীবনকে বিবেচনা করা হচ্ছে দুঃখের অন্ধকার উপত্যকা হিসাবে, অন্ততঃ ধর্মীয় মতবাদের দৃষ্টিতে। জীবন হচ্ছে দুই

www.pathagar.com

বিরোধী শক্তির সংগ্রাম ক্ষেত্রঃ অমংগলের প্রতীক শয়তান ও কল্যাণের প্রতীক যীশু খৃষ্ট। দৈহিক লোভ দেখিয়ে শয়তান ব্যাহত করছে চিরন্তন আলোকের পথে মানবাত্মার অগ্রগতি; আত্মা হচ্ছে খৃষ্টের অধিকারে, আর দেহ হচ্ছে শয়তানী প্রভাবের লীলাভূমি। আলাদাভাবে বলা যায় যে, বস্তু-জগত হচ্ছে অপরিহার্যরূপে শয়তানী, আর আত্মিক জগত হচ্ছে খোদায়ী ও সৎ। মানব প্রকৃতিতে যা' কিছু দৈহিক (Material) অথবা খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলা হয়, রক্ত-মাংসের দেহ সংক্রান্ত (Carnal), তা' হচ্ছে অন্ধকার ও বস্তু জগতের নারকীয় অধিপতির (শয়তান) মন্ত্রনার ফলে আদমের 'পতনের প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং মুক্তি-লাভের জন্য মানুষের আত্মাকে ফিরাতে হবে রক্ত-মাংসের দুনিয়া থেকে ভবিষ্যৎ আত্মিক জগতের দিকে, যেখানে ক্রুসবিদ্ধ খৃষ্টের আত্মবিসর্জনের ফলে 'মানব জাতির পাপের' প্রায়শ্চিত্ত হয়।

যদিও এই ধর্মমত কখনো বাস্তবে প্রতিপালিত হয় না বা হয়নি, তথাপি এ ধরনের শিক্ষার অস্তিত্বই তো ধর্ম প্রবন মানুষের মধ্যে একটা অসৎ মনের স্থায়ী ধারণা সৃষ্টি করে তোলে। এক দিকে দুনিয়াকে উপেক্ষা করার জরুরী আহ্বান ও অপর দিকে বাঁচবার ও বর্তমান জীবনকে উপভোগ করার জন্য অন্তরের স্বাভাবিক আকাংখা-এ দু'য়ের মাঝখানে সে থাকে দোদুল্যমান অবস্থায়। উত্তরাধিকার ব'লেই অপরিহার্য পাপের ধারণা এবং সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির কাছে অবোধ্য ক্রুশবিদ্ধ যীশুর দুঃখভোগের মাধ্যমে মানবের পাপমুক্তির ধারণা মানুষের আত্মিক চাহিদা ও তার বাঁচার ন্যায়সংগত আকাংখার মধ্যে এক বাধার প্রাচীর গ'ড়ে তোলে।

ইসলামে কোনো মৌলিক পাপের সন্ধান আমরা পাই না; এ ধরনের ধারণাকে আমরা মনে করি আল্লাহ্‌র বিচারের ধারণার সাথে অসামঞ্জস্যমূলক। আল্লাহ্ পিতার কৃত কর্মের জন্য সন্তানকে দায়ী করেন না; তা'হলে কি করে তিনি এক সুদূর পূর্বপুরুষের কৃত অবাধ্যতার

www.pathagar.com

পাপের জন্য দায়ী করতে পারেন অসংখ্য পুরুষ ধ'রে সকল মানুষকে? এই বিচিত্র ধারণার দার্শনিক ব্যাখ্যা গড়ে তোলা নিঃসন্দেহে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির কাছে এ ধারণা সব সময়েই থাকবে কৃত্রিম ও ত্রিত্ববাদের ধারণার মতো অসন্তোষজনক। ইসলামের শিক্ষায় যেমন নেই কোনো পাপের উত্তরাধিকার, তেমনি নেই মানব জাতির সর্বজনীন পাপমুক্তির অবকাশ। মুক্তি ও পতন দুই-ই ব্যক্তিগত। প্রত্যেক মুসলিমই তার নিজের মুক্তিদাতা; তার অন্তরেই রয়েছে তার আত্মিক সাফল্য ও ব্যর্থতার সকল সম্ভাবনা। মানব-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ـ

"তার পক্ষে রয়েছে তাই, যা সে অর্জন করেছে আর তার বিরুদ্ধে রয়েছে তা-ই যার জন্য সে দায়ী।" (সুরা ২ ঃ ২৮৬)

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

لَيْسَ لِلاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى ـ

"মানুষ যার জন্য সংগ্রাম করেছে, তা'ছাড়া তার জন্য আর কিছুই গণ্য করা হবে না।" (সুরা ৫৩ঃ৩৯)

ইসলাম যদিও খৃষ্টধর্মের মতো জীবনের অন্ধকার দিকটাই মানুষের সামনে তুলে ধরে না, তথাপি আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার মতো পার্থিব জীবনের ওপর অত্যধিক বাহুল্যপূর্ণ মূল্য আরোপ করতেও সে নিষেধ করে। খৃষ্টীয় দৃষ্টিভংগিতে যেখানে পার্থিব জীবন অবাঞ্ছিত, তেমনি আধুনিক পশ্চিম খৃষ্টধর্ম থেকে আলাদা ধারায় জীবনকে এমনভাবে পূজা করে, যেমন পেটুক পূজা করে তার খাদ্যবস্তুকে; যদিও সে তা' গলাধঃকরণ করে, তবু তাকে কোনো মর্যাদা সে দেয় না। পক্ষান্তরে, ইসলাম পার্থিব জীবনকে দেখে প্রশান্তি ও মর্যাদার দৃষ্টিতে। ইসলাম তার পূঁজা করে না, বরং তাকে মনে করে আমাদের উচ্চতর অস্তিত্বের পথে একটা আংগিক পর্যায়। কিন্তু যেহেতু এটা একটা পর্যায়

www.pathagar.com

এবং প্রয়োজনীয় পর্যায়ও বটে, সুতরাং জীবনকে উপেক্ষা করার অথবা তার মূল্য ছোট করে দেখার অধিকার মানুষের নেই। এই দুনিয়ায় আমাদের সফর আল্লাহর পরিকল্পনার এক প্রয়োজনীয় ও নির্দিষ্ট অংশ। সুতরাং মানব-জীবনের রয়েছে এক বিরাট মূল্য; কিন্তু আমাদের কখনো ভুল্‌লে চলবে না যে, এ হচ্ছে নিছক যান্ত্রিক ধরনের মূল্য। আধুনিক বস্তুবাদী পাশ্চাত্য যেমন বলেঃ 'আমার রাজত্ব কেবল এই দুনিয়াকে নিয়ে', ইসলামে তেমন কোনো আশাবাদের স্থান নেই; তেম্‌নি খৃষ্ট ধর্মের মতো 'আমার রাজত্ব এ দুনিয়ার নয়' ব'লে জীবনকে উপেক্ষা করার পক্ষপাতীও ইসলাম নয়। ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে এদিক দিয়ে। কুরআন শরীফ আমাদেরকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ـ

"হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদেরকে কল্যাণ দান কর দুনিয়ায় এবং কল্যাণ দান কর আখেরাতে।" (সূরা ২ ঃ ২০১)

এমনি করে এই দুনিয়া ও তার কল্যাণের পূর্ণ উপলব্ধি কোনোক্রমেই আমাদের আত্মিক প্রচেষ্টার পথে বাধা সৃষ্টি করে না। বস্তুবাদী অগ্রগতি বাঞ্চনীয়, যদিও তা আমাদের লক্ষ্য নয়: আমাদের সর্বপ্রকার বাস্তব কার্যকলাপের লক্ষ্য হবে এমন ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যবস্থা সৃষ্টি ও সংরক্ষণ, যা' মানুষের নৈতিক শক্তির ক্রমবিকাশের সহায়ক হতে পারে। এ নীতি অনুসারে মানুষ বড়ো ছোট যে কোনো কাজ করুক না কেন, তার ভিতরে একটা নৈতিক দায়িত্বের চেতনার পথে ইসলাম তাকে চালিত করে। 'সীজারের পাওনা সীজারকে দাও, আর খোদার পাওনা খোদাকে দাওঃ খৃষ্টীয় সুসমাচারের এই যরুরী নির্দেশের স্থান নেই ইসলামের ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে, কারণ ইসলাম আমাদের নৈতিক এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের মধ্যে কোনোরুপ সংঘাতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। যে-কোনো ক্ষেত্রে একটি মাত্র নির্বাচনের অবকাশ রয়েছেঃ ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে

www.pathagar.com

নির্বাচন, আর কোনো মধ্যপন্থা নেই। সুতরাং কর্মের কঠোর তাকিদই হচ্ছে নৈতিকতার অপরিহার্য উপাদান।

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের চার পাশে যে-সব ঘটনা ঘটছে, তার জন্য নিজকে দায়ী মনে করতে হবে এবং প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের চেষ্টা করতে হবে। কুরআনের আয়াতে এই মনোভাব অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছেঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ

"তোমরাই হচ্ছো মানব জাতির কাছে প্রেরিত শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় (উম্মত); তোমরা ন্যায় কার্যের নির্দেশ দান কর ও অন্যায়কে নিষেধ কর; এবং তোমরা ঈমান পোষণ কর আল্লাহর ওপর।" (সূরা ৩ ঃ ১১০)

এ হচ্ছে ইসলামের আক্রমণাত্মক কর্মবাদের নৈতিক যৌক্তিকতা, ইসলামের প্রাথমিক বিজয় ও তার তথাকথিত 'সাম্রাজ্যবাদের' সংগতি। যদি আপনারা 'সাম্রাজ্যবাদী' শব্দটিই প্রয়োগ করতে চান, তা'হলে ইসলাম 'সাম্রাজ্যবাদীই' ছিলো; কিন্তু এ ধরনের সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যের স্পৃহা দ্বারা প্রবুদ্ধ নয়, অর্থনৈতিক বা জাতীয় স্বার্থপরতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই; অপর জাতির স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে মুসলিমদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির লোভ এর ভিতরে নেই; অথবা এর ভিতরে কোনো অবিশ্বাসীকে বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষা দেবার গরজও ছিলো না কখনো। আজকের মতো তখনও এর একমাত্র লক্ষ্য ছিলো মানুষের সর্বোত্তম আত্মিক বিকাশের জন্য পার্থিব কাঠামো তৈরী করা। কারণ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নৈতিক জ্ঞান মানুষের ওপর নৈতিক দায়িত্ব ন্যস্ত করে। ন্যায়ের অগ্রগতি ও অন্যায়ের ধ্বংস বিধানের চেষ্টা ব্যতীত ন্যায়-অন্যায়ের নিছক প্রেটোবাদী চিন্তা নিজেই জঘন্যভাবে নৈতিকতার বিরোধী। ইসলামে দুনিয়ায় নৈতিকতার বিজয় প্রতিষ্ঠার মানবীয় প্রচেষ্টার ওপরই নির্ভর করে তার জীবন-মরণ।

www.pathagar.com

পশ্চিমের ভাবধারা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইসলামের নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, ইসলাম হচ্ছে আবহমান কাল ধ'রে ইতিহাসে পরিচিত ধর্মতন্ত্রের (Theocracy) সর্বাধিক পরিপূর্ণ রূপ। এখানে সর্বোপরি রয়েছে ধর্মীয় বিবেচনা এবং তা' দ্বারাই সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে এ মনোভাবের তুলনা করলে আমরা এর দৃষ্টিভংগির ব্যাপক পার্থক্যে মুগ্ধ হই।

আধুনিক পাশ্চাত্যে তার কার্যকলাপ ও কর্মপ্রচেষ্টা কেবলমাত্র বাস্তব প্রয়োজন ও চলিষ্ণু সম্প্রসারণের নীতি দ্বারা চালিত। তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে এ জীবনের ওপর তার নিজস্ব নৈতিক বাস্তবতা আরোপ না করে জীবনের সম্ভাবনা সম্পর্কে পরীক্ষা করে তাকে আবিষ্কার করা। আধুনিক ইউরোপীয় বা আমেরিকাবাসীর কাছে জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্যের প্রশ্ন দীর্ঘকাল ধরে তার বাস্তব গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে কেবলঃ জীবন কেমন রূপ পরিগ্রহ করতে পারে এবং মানবজাতি পরিণামে প্রকৃতির ওপর প্রভূত্ব কায়েম করবার পথে অগ্রসর হচ্ছে কিনা! শেষোক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আধুনিক পশ্চিমের বাসিন্দার কাছে স্বীকৃতিসূচক জবাব মিলবে; এবং এখানে সে ইসলামের সাথে একমত। কুরআন মজীদে আল্লাহ আদম ও তাঁর জাতির উল্লেখ করে বলেনঃ

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ـ

"নিশ্চয়ই আমি আমার প্রতিনিধি, প্রেরণ করবো দুনিয়ার বুকে। (সূরা ২ ঃ ৩০)

www.pathagar.com

এর সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, মানুষ দুনিয়ার বুকে শাসন চালাবে ও অগ্রগতি লাভ করবে। কিন্তু মানবীয় অগ্রগতির মান সম্পর্কে ইসলামী ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগির মধ্যে তফাৎ রয়েছে। আধুনিক পশ্চিম বাস্তব কৃতিত্ব ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশের পথ ধরে সামগ্রিক ধারণায় মানবজাতির ক্রমাগত আত্মিক উন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে। ইসলামী দৃষ্টিভংগি অবশ্য মানবতা সম্পর্কে পশ্চিমের এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী চলিষ্ণু ধারণার সরাসরি বিরোধী। সমষ্টি-সত্তা 'মানব জাতির' আত্মিক সম্ভাবনাকে ইসলাম মনে করে স্থবির পরিমাণ (Static quantity), যেনো মানব-প্রকৃতির গঠনের মধ্যেই নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত একটা কিছু। ইসলাম পাশ্চাত্যের মতো স্বীকার করে নেয় না যে, মানব-প্রকৃতি তার সাধারণ ব্যক্তিত্বের অতীত ধারণা অনুসারে একটি বৃক্ষের ক্রমবর্ধনের অনুরূপভাবে ক্রমাগত পরিবর্তন ও উন্নতির ধারা অতিক্রম করে চলেছে; কারণ সে প্রকৃতির বুনিয়াদ মানবাত্মা একটি জীবতাত্ত্বিক পরিমাণ (Biological quantity) নয়। আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারায় বস্তুবাদী জ্ঞান ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধিকে মানব জাতির আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির সমার্থক ধরে নেবার মতো মৌলিক ভ্রান্তি অ-জীবতাত্ত্বিক সত্যের ক্ষেত্রে জীবতাত্ত্বিক সত্যের বিধি প্রয়োগের মতো সমভাবে মৌলিক ভ্রান্তির কারণেই সম্ভব হয়েছে। আমরা যাকে বলি 'আত্মা', তার ওপর আধুনিক পশ্চিমের অবিশ্বাসই রয়েছে এর মূলে। ইসলাম অতীন্দ্রিয় ধারণার ভিত্তিযুক্ত ব'লেই আত্মাকে মনে করে সন্দেহ বা আলোচনার অতীত বাস্তব। বাস্তব অগ্রগতি ও আত্মিক অগ্রগতি মানব-জীবনের দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দিকের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলেই পরস্পর বিরোধী না হলে ও অভিন্ন-এক নয়; এবং এই দুই ধরনের অগ্রগতি যে পরস্পর নির্ভরশীল হবেই, এমন কোনো কথা নেই। একই সঙ্গে উভয় দিকের বিকাশ সাধন হতে পারে, কিন্তু তা অপরিহার্য নয়।

ইসলাম সমষ্টিগতভাবে মানবজাতির বাইরের বাস্তব অগ্রগতির সম্ভাবনা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে এবং তার প্রতি বলিষ্ঠ গুরুত্ব আরোপ

www.pathagar.com

করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিগত কৃতিত্বের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে মানবতার আত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা অস্বীকার করে সুস্পষ্টভাবে। আত্মিক উন্নতির চলিষ্ণু উপাদান ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আত্মিক ও নৈতিক বিকাশের অবকাশ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যেই সম্ভব। সম্ভবতঃ আমরা সমষ্টিগতভাবে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পরি না। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ব্যক্তি হিসাবে তার আত্মিক লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম করতে হবে; এবং প্রত্যেককেই তার সংগ্রামের শুরু ও শেষ করতে হবে নিজের আত্মাকে নিয়ে।

মানুষের আত্মিক পরিণতির এই স্বীকৃত ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভংগির ভারসাম্য বিধান করে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দান করেছে ইসলাম তার সমাজ ও সামাজিক সহযোগিতার ধারণা দ্বারা। সমাজের কর্তব্য হচ্ছে বাহ্য জীবনকে এমনভাবে সুসংহত করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার আত্মিক লক্ষ্যের পথে যথাসম্ভব বাধা এড়িয়ে চলতে পারে এবং তাতে সে যথাসম্ভব বেশী প্রেরণা লাভ করতে পারে। এই কারণেই ইসলামী কানুন বা শরিয়ত মানব-জীবনের আত্মিক ও বাস্তব উভয় দিকের সাথে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় বৈশিষ্ট্য সহকারে সমভাবে সংশ্লিষ্ট।

যে ধারণার কথা এখানে বলা হলো, তা সম্ভব হতে পারে কেবল মানবাত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে; সুতরাং মানব-জীবনের লোকোত্তর উদ্দেশ্যে, বিশ্বাসের ভিত্তিতেও বটে। কিন্তু যে-ভাবে পাশ্চাত্যের আধুনিক মানুষ আত্মার অস্তিত্বকে উপেক্ষাভরে আধা-অস্বীকার করে থাকে, তাতে তার কাছে জীবনের উদ্দেশ্যের প্রশ্নের কোনো বাস্তব গুরুত্ব নেই। সব রকম মানব-জ্ঞানের অতীত কল্পনা ও বিবেচনাকে পশ্চাতে ফেলেই সে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমরা যাকে বলি ধর্মীয় মনোভাব সব সময়েই তার মূলে থাকে এই বিশ্বাসের বুনিয়াদ যে, সর্বোপরি এক সর্বব্যাপক লোকাতীত নৈতিক বিধানের অস্তিত্ব রয়েছে এবং মানুষ আমরা তার অনুজ্ঞার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য। কিন্তু

www.pathagar.com

আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা অর্থনৈতিক বা সামাজিক বা জাতীয় প্রয়োজন ব্যতীত অপর কিছুর কাছে আত্মসমর্পণ করবার প্রয়োজন স্বীকার করতে রাযী নয়। তার উপাস্য দেবতা আত্মিক ধরণের নয়; সে হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্য (Comfort)। আর তার খাঁটি জীবন দর্শনের প্রকাশ পেয়েছে ক্ষমতার খাতিরে ক্ষমতা অর্জনের ইচ্ছার ভিতর দিয়ে। এর উভয়ই হচ্ছে প্রাচীন রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকার।

যাঁরা প্রাচীন ইসলামী সাম্রাজ্যের সাথে বারংবার রোমান সাম্রাজ্যের তুলনা করতে শুনেছেন, তাঁদের কাছে একথা অদ্ভুত শোনাতে পারে যে, আধুনিক পাশ্চাত্য জড়বাদের উৎপত্তির জন্য অন্ততঃ কিছুটা হলেও, রোমান সভ্যতাই দায়ী। অতীতে যদি উভয়ের রাজনৈতিক প্রকাশের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য থেকে থাকে, তা হলে ইসলাম ও আধুনিক পাশ্চাত্যের মৌলিক ধারণার মধ্যে এতটা বিঘোষিত বৈষম্য কি করে এলো? এর সোজা জবাব হচ্ছেঃ প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ছিলো না। কৃত্রিম আধা-বিজ্ঞান যে সব মামুলী ঐতিহাসিক মন্তব্য দিয়ে এ-যুগের মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করে, পূর্বোক্ত বারংবার উদ্ধৃত তুলনা হচ্ছে তারই অন্যতম। ইসলামী ও রোমান উভয় সাম্রাজ্য বহু বিস্তৃত বিভিন্ন জাতীয় মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলো, এছাড়া তাদের মধ্যে আর কোনো সাদৃশ্যই নেই , কারণ তাদের অস্তিত্বকালে এই দুই সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চালক-শক্তি (Motive forces) দ্বারা চালিত হয়েছে এবং বলতে গেলে তাদের সামনে ছিলো স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য। এমন কি, সংগঠনের দিক দিয়েও ইসলামী ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে আমরা ব্যাপক পার্থক্য দেখতে পাই। রোমান সাম্রাজ্যকে তার পূর্ণ ভৌগোলিক ব্যাপ্তি ও রাজনৈতিক পরিপক্কতার পর্যায়ে পৌছাতে প্রায় হাজার খানেক বছর লেগেছিলো, অথচ ইসলামী সাম্রাজ্যের উত্থান ও পূর্ণতা লাভে লেগেছিলো কম বেশী করে আশী বছর। তাদের পতনের দিক দিয়ে পার্থক্য আরো বেশী বিস্ময়কর। রোমান সাম্রাজ্যের পতন চূড়ান্তরূপ গ্রহণ

www.pathagar.com

করেছিলো হুন ও গথ জাতির দেশত্যাগে; আর মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে তার পতনের সমাপ্তি ঘটেছিলো এবং এমন ব্যাপকভাবে সে পতন ঘটেছিলো যে, সাহিত্য ও স্থাপত্য ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। যে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ব'লে সাধারণভাবে ধরা হয়, তার উত্তরাধিকারের মাত্রা এতটা যে, একদা রোমান সাম্রাজ্যের শাসিত কতকগুলি অঞ্চলে তারা কেবল শাসন চালিয়ে গেছে। তার সামাজিক কাঠামো ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে রোমান শাসন-ব্যবস্থার কোনো সংযোগই ছিলো না পক্ষান্তরে, যে ইসলামী সাম্রাজ্য খেলাফতরূপ লাভ করেছিলো, তার দীর্ঘ অস্তিত্বের আমলে নিঃসন্দেহে বহুবিধ বিকৃত ও গোষ্ঠি পরিবর্তনের ধারা এসেছিলো, কিন্তু তার কাঠামো অপরিহার্যরূপে একই ছিলো। হুন ও গথদের হাতে রোমান সাম্রাজ্য যে আক্রমণের আঘাত সহ্য করেছে, তার চাইতেও কঠিন আঘাত হেনেছে ইসলামী সাম্রাজ্যের ওপর মোংগল আক্রমণ, কিন্তু তাতেও খলিফাদের সাম্রাজ্যের সামাজিক সংগঠন ও অভগ্ন রাজনৈতিক অস্তিত্বের মূলে নাড়া দিতে পারেনি, যদিও তা নিঃসন্দেহে পরবর্তী আমলের অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত স্থবিরতার পথ খোলাসা করেছে। রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হতে যে এক শতাব্দী সময় লেগেছিলো, তার তুলনায় ইসলামী সাম্রাজ্যের পতনে লেগেছে প্রায় হাজার বছর এবং তার চরম পতন এসেছে ওস্‌মানিয়া সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে। তারপর থেকেই দেখা দিয়েছে সামাজিক ভাঙনের লক্ষণ, যা আমরা আজকের দিনে লক্ষ্য করছি।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে বাধ্য হই যে, আবহমানকাল ধরে মানবজাতি যে সব সামাজিক সংগঠনের সাথে পরিচিত হয়েছে, তার মধ্যে ইসলামী জাহানের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সামাজিক সুষ্ঠতা সব চাইতে শ্রেষ্ঠ। এমন কি, যে চীনা সভ্যতা বহু শতাব্দী ধরে নিঃসন্দেহে অনুরূপ প্রতিরোধ-শক্তির পরিচয় দিয়েছে, তাকেও এখানে তুলনা হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। চীনের অবস্থান

www.pathagar.com

একটি মহাদেশের প্রান্তদেশে এবং অর্ধশতাব্দী আগে অর্থাৎ আধুনিক জাপানের অভ্যুত্থান পর্যন্ত যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির নাগালের বাইরেই ছিলো; চেংগিস খান ও তার উত্তরাধিকারীদের আমলের মোংগল আক্রমণ চীন সাম্রাজ্যের প্রান্তভাগের বেশী স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিলো তিনটি মহাদেশের ওপর এবং সব সময়েই তার চারিদিক ঘিরে ছিলো অমিত বলশালী দুশমন–শক্তি। ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে তথাকথিত নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য ছিলো বংশগত ও সাংস্কৃতিক শক্তির সংঘর্ষের অগ্ন্যুদগীরণ কেন্দ্র; কিন্তু অন্ততঃপক্ষে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইসলামী সামাজিক সংগঠনের প্রতিরোধ শক্তি ছিলো অজেয়। এই বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের বহু দূরে সন্ধান করতে হয় না; কুরআন শরীফের ধর্মীয় শিক্ষাই পত্তন করেছিলো এক মযবুত বুনিয়াদ, আর হযরত রাসূলে করীম মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)–এর জীবনাদর্শ সেই অত্যদ্ভুত সামাজিক কাঠামোর চারদিকে এক ইস্পাতবন্ধনী রচনা করেছিলো। রোমান সাম্রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করে রাখবার জন্য তেমন কোনো আত্মিক উপাদান ছিলো না; সুতরাং তার ভিতরে এসেছিলো দ্রুত ভাঙ্গন।

দুই প্রাচীন সাম্রাজ্যের মধ্যে আরো একটি পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী সাম্রাজ্যে যেখানে কোনো বিশেষ সুবিধাভোগী ভাগ্যবান জাতির অস্তিত্ব ছিলো না এবং তার মশালবাহীরা অতুলনীয় ধর্মীয়সত্য হিসেবে গৃহীত ধারণা প্রচারের কাজেই নিজেদের সকল শক্তি নিয়োগ করতো, সেখানে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত ধারণা ছিলো শক্তির অধিকার অর্জন ও মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য অপর জাতির ওপর শোষণ চালানো। একটি বিশেষ সুবিধাভোগী দলের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কোনো হিংসাত্মক কাজই রোমানদের কাছে খারাব বিবেচিত হতো না, কোনো অবিচারকে তারা নীচ মনে করতো না। বিখ্যাত রোমান বিচার (Roman Justice) বলতে বুঝাতো কেবল রোমানদের জন্য বিচারসংগত আচরণ। এটা সুস্পষ্ট যে, এমনি একটা মনোভাব সম্ভব হয়েছে কেবল জীবন ও

www.pathagar.com

সভ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জড়বাদী ধারণার বুনিয়াদে, যে জড়বাদ নিশ্চিতরূপে বুদ্ধিবৃত্তির কাছে রুচিসংগত, কিন্তু তা সত্তেও যে কোনো আত্মিক মাপকাঠিতে গ্রহণের অযোগ্য। তাদের চিরাচরিত উপাস্য দেবতার দল ছিলো গ্রীক পুরানের অস্পষ্ট অনুকরণ, সামাজিক রীতির খাতিরে নীরবে স্বীকৃত নিছক বর্ণহীন ভূতের দল। কোনো দিক দিয়েই এইসব দেবতাকে 'বাস্তব' জীবনের ওপর হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হয়নি। প্রয়োজন মতো তারা পুরোহিতদের মাধ্যমে প্রত্যাদেশ দিতো; কিন্তু তারা যে কখনো মানুষকে কোনো নৈতিক বিধান দেবে বা তাদের কার্যকলাপের পথ নির্দেশ করবে, এমন কোনো কথা ছিলো না।

এমন এক পটভূমির ওপর গড়ে উঠেছে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা। নিঃসন্দেহে তার বিকাশের ধারায় এসেছে অন্যান্য বহুবিধ প্রভাব এবং স্বাভাবিকভাবেই তাকে একাধিক দিক দিয়ে রোমের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে পরিবর্তন ও সংশোধন করতে হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আজকের পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্র ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগিতে যা' কিছু বাস্তব, তার মূল খুঁজে পাওয়া যায় প্রাচীন রোমান সভ্যতায়। প্রাচীন রোমের বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত ও সামাজিক আবহাওয়া ছিলো সম্পূর্ণ উপযোগবাদী ও ধর্মবিরোধী–যদিও তা প্রকাশ্যে স্বীকৃত হয়নি, আর আজকের আধুনিক পশ্চিমের আবহাওয়াও তা' থেকে অভিন্ন। লোকোত্তর ধর্মের বিরুদ্ধে কোনোরূপ প্রমাণ পেশ না করে এবং এমন কি, তেমন কোনো প্রমাণের প্রয়োজন স্বীকার না করে আধুনিক পশ্চিমী চিন্তাধারা যেমন ধর্মকে সহ্য করে যায় এবং কখনো কখনো সামাজিক রীতি হিসেবে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, তেমনি সাধারণভাবে লোকোত্তর নীতিবাদকে সে রেখে দেয় বাস্তব বিবেচনার গন্ডির বাইরে। পশ্চিমী সভ্যতা কঠোরভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, কিন্তু তার বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তি–সংক্রান্ত ধারায় আল্লাহর কোনো স্থান নেই এবং তার কোনো প্রয়োজনও সেখানে অনুভূত হয় না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত সংকটের ভিতর দিয়ে সে গড়ে তুলেছে একটি

www.pathagar.com

স্বভাব–জীবনের সমগ্রতা উপলব্ধিতে তার অসামর্থ্য। এইভাবে আধুনিক পাশ্চাত্যের মানুষ কেবল সেইসব ধারণার ওপরই বাস্তব গুরুত্ব আরোপ করতে পারে, যা ভূয়োদর্শনলব্ধ বিজ্ঞানের গন্ডির ভিতর আসে, অথবা অন্ততঃপক্ষে যা' নির্দিষ্টভাবে মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে। যেহেতু প্রাথমিক বিবেচনা আল্লাহর অস্তিত্ব এই দুই শ্রেণীর ধারণার কোনোটার মধ্যেই পড়ে না, তাই পাশ্চাত্য মনে যে কোনো বাস্তব কর্তব্যের ক্ষেত্রে আল্লাহকে নির্বাসিত করবার প্রবণতাই দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন ওঠেঃ কি করে খৃষ্টীয় চিন্তাধারার সাথে এ মনোভাবের সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে? যে খৃষ্টধর্মকে মনে করা হয় পশ্চিমী সভ্যতার আত্মিক উৎস, তা কি লোকোত্তর নীতিবাদের বুনিয়াদের ওপর গড়ে ওঠা ধর্ম নয়? অবশ্যিই তাই। কিন্তু তা যদি হয়, তা' হলে পশ্চিমী সভ্যতাকে খৃষ্টধর্মেরই অবদান বলার চাইতে বড়ো ভুল আর কিছুই হতে পারে না। কোনোরূপ লোকোত্তর দৃষ্টিভংগি বর্জিত নিছক উপযোগবাদী ধারণা হিসেবে আধুনিক পশ্চিমের প্রকৃত বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত বুনিয়াদ খুঁজে পাওয়া যাবে জীবন সম্পর্কে প্রাচীন রোমান ধারণার ভিতরে। তাদের এ মনোভাবকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলা যায়, 'যেহেতু আমরা নির্দিষ্টভাবে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গণনা দ্বারা মানব জীবনের উদ্ভব ও দৈহিক মৃত্যুর পর তার পরিণতি সম্পর্কে কিছুই জানি না, সেই কারণে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বিরোধী অনুমানের ভিত্তিযুক্ত লোকোত্তর নীতিবাদ ও নৈতিক বিধান দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে আমাদের সকল উদ্যম বাস্তব ও বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্ভাবনার বিকাশ সাধনে পূর্নরূপে নিয়োগ করাই উত্তম।' আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার এই বহু–প্রচলিত মনোভাব ইসলাম অথবা যে কোনো ধর্মের ন্যায় খৃষ্টধর্মের নিকটও গ্রহণের অযোগ্য, কারণ সারবস্তুর দিক দিয়েই তা ধর্মবিরোধী। সুতরাং খৃষ্টধর্মের শিক্ষাকে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার বাস্তব কৃতিত্বের কারণ হিসেবে ধরে নেয়া অত্যন্ত হাস্যকর। যে শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী উন্নতির দিক দিয়ে

www.pathagar.com

পশ্চিমের বর্তমান সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতাকে অতিক্রম করে গেছে, তাতে খৃষ্টধর্মের দান কিছুই নেই বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে, খৃষ্টীয় ধর্মমত ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগীর বিরুদ্ধে যুগ যুগান্তর ধরে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তির সংগ্রাম থেকেই সে সব কৃতিত্ব অর্জিত হয়েছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রকৃতির প্রতি অবজ্ঞাসূচক এক ধর্মীয় পদ্ধতি ইউরোপের আত্মাকে পীড়ন করেছে। যীশুর প্রচারিত বাণীর (gospel) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে, অন্যায়ের কাছে নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মসমর্পণের দাবী, আদম ও হাওয়ার স্বর্গচ্যুতির কারণ এই অভিযোগে জীবনের যৌন প্রবণতার অস্বীকৃত মৌলিক পাপ ও ক্রুসবিদ্ধ যীশু খৃষ্টের আত্মদানের ফলে তার প্রায়শ্চিত্ত সব কিছু মিলে তা' মানব জীবনের ব্যাখ্যা করেছে একটা সুনির্দিষ্ট স্তর হিসেবে নয় বরং প্রায় প্রয়োজনীয় দুষ্কৃতির পর্যায় হিসেবে–আত্মিক অগ্রগতির পথে শিক্ষাগত বাধা হিসেবে এটা সুস্পষ্ট যে, এই ধরণের বিশ্বাস পার্থিব জ্ঞান সংক্রান্ত উদ্যমশীল প্রচেষ্টায় ও পার্থিব জীবনের অবস্থার উন্নতি বিধানে উৎসাহ যোগায় না। প্রকৃতপক্ষে, সুদীর্ঘকাল ধরে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তি মানব অস্তিত্ব সম্পর্কে এই অশুভ ধারণা দ্বারা দমিত হয়েছে। মধ্য যুগে যখন গীর্জাই ছিলো সর্বশক্তির আধার, তখন ইউরোপের না ছিলো কোনো প্রাণশক্তি, না ছিলো বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে তার কোন স্থান। এমনকি, একদা যা' থেকে ইউরোপীয় সাংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিলো, সেই রোম ও গ্রীসের দার্শনিক কৃতিত্বের সাথেও সে সব রকম সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছিলো। বুদ্ধিবৃত্তি বিদ্রোহ করেছিলো একাধিকবার; কিন্তু বারংবার তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে গীর্জার কাছে। মধ্য যুগের ইতিহাস ইউরোপীয় প্রতিভা ও গীর্জার ভাবধারার মধ্যে সেই তীব্র সংঘর্ষের কাহিনীতে ভরপুর।

খৃষ্টীয় ধর্মমত মানুষকে যে বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে রেখেছিলো তা' থেকে ইউরোপীয় মনের মুক্তি সম্ভব হয়েছে রেনেসাঁর আমলে। কয়েক শতাব্দী ধরে আরবরা পাশ্চাত্যে যে

www.pathagar.com

নতুন সাংস্কৃতিক প্রেরণা ও ধারণা বহন করে নিয়েছিলো, তা' ছিলো এর অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রাথমিক ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কয়েক শতকে আরবরা প্রাচীন গ্রীক ও হেলেনীয় আমলের সভ্যতার কল্যাণকর দিকগুলো তাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করে তার উন্নতি বিধান করেছিলো। আমি একথা বলি না যে, হেলেনীয় চিন্তাধারা আত্মস্থ করে আরবরা এবং সাধারণভাবে মুসলমানরা কেবল কল্যাণই লাভ করেছিলো, কারণ, প্রকৃত অবস্থা তা' নয়। হেলেনীয় সাংস্কৃতির পুনরুত্থানের ফলে ইসলামী ধর্মশাস্ত্র ও বিধানের মধ্যে এরিস্টোটোলিয়ান ও নিওপ্লেটোনিক দর্শনের অনুপ্রবেশ দ্বারা মুসলিমদের যতোই অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে থাকুক না কেন, আরবদের মারফতে তা' ইউরোপীয়দের মনে বলিষ্ঠ প্রেরণা যুগিয়েছে। মধ্যযুগ ইউরোপের উৎপাদন-ক্ষমতা নিঃশেষ করে দিয়েছিলো। বিজ্ঞান তখন নিশ্চল, কুসংস্কার তখন সর্বোপরি প্রভাব বিস্তার করেছে, সামাজিক জীবন তখন এতোটা আদিম ও অপরিপক্ক যে, আজ তা' কল্পনা করাও দুরূহ। এমনি এক যুগে প্রথমতঃ প্রাচ্যে ক্রুসেড-অভিযান ও পাশ্চাত্যে মুসলিম স্পেনের আলোকদীপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মাধ্যমে এবং পরবর্তীকালে জেনোয়া ও ভেনিসের প্রজাতন্ত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ক্রমবর্ধিষ্ণু বাণিজ্য সম্পর্কের মাধ্যমে ইসলামী জাহানের সাংস্কৃতিক প্রভাব ইউরোপীয় সভ্যতার রুদ্ধ দ্বারে আঘাত হানলো। ইউরোপীয় সুধী ও চিন্তানায়কদের ঝল্‌সে-যাওয়া চোখের সামনে এসে হাযির হলো এমন এক সভ্যতা, যা' রুচিসংগত, গতিশীল, উদ্দাম প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ এ মন এক সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, ইউরোপ যা' হারিয়ে ফেলেছে ও ভুলে গেছে বহু যুগ আগে। আরবরা যা' করেছিলো, তা' প্রাচীন গ্রীসের পুনরুত্থানের চাইতে বহুগুণ বেশী। তারা গড়ে তুলেছিলো তাদের নিজস্ব বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নতুন জগত এবং খুলে দিয়েছিলো গবেষণা ও দর্শনের অজানা নতুন পথ। বিভিন্ন পথে তারা তা' পৌঁছে দিয়েছিলো পাশ্চাত্য জগতের হাতে; এবং একথা বললে বেশী

www.pathagar.com

বলা হবে না যে, আজকে আমরা যে, বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি, তার সূচনা খৃষ্টান ইউরোপের কোনো শহরে হয়নি, হয়েছিলো দামেস্ক, বাগদাদ, কাহেরা, কর্ডোভা, নিশাপুর, সমরকন্দের মতো ইসলামের কেন্দ্রভূমিতে।

ইউরোপের ওপর এই সব প্রভাবের ফল হয়েছিলো ব্যাপক। ইসলামী সভ্যতার স্পর্শে এক নতুন জ্ঞানের আলোকশিখা পাশ্চাত্যের আকাশ প্রদীপ্ত ক'রে তুললো এবং তার ভিতরে সঞ্চার করলো নতুন জীবন ও গতিচাঞ্চল্য। এর মূল্য উপলব্ধি করেই ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা সেই নব জাগরণ যুগের নামকরণ করেছিলেন রেনেসাঁ– মানে 'নবজন্ম' এটা ছিলো সত্যি সত্যিই ইউরোপের নবজন্ম।

ইসলামী তমদ্দুন থেকে প্রবহমান নবচেতনার ধারা ইউরোপের সুধীমনকে নতুন উদ্যমে খৃষ্টীয় গীর্জার বিপজ্জনক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার শক্তি দান করলো। গোড়ার দিকে এই প্রতিযোগিতার বাইরের রূপ ছিলো সংস্কার–আন্দোলনের এবং তার উন্মেষ হয়েছিলো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে একই সময়ে জীবনের নতুন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে খৃষ্টীয় চিন্তা–পদ্ধতিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। তাদের দিক দিয়ে এটি ছিলো একটি সুষ্ঠু আন্দোলন এবং তারা প্রকৃত আত্মিক সাফল্য লাভ করতে পারলে ইউরোপে বিজ্ঞান ও ধর্মীয় চিন্তাধারার মধ্যে নিশ্চিত আপোষ আনয়ন করতে পারতো। কিন্তু মধ্যযুগীয় গীর্জার দুষ্কৃতির ফল এমন সুদূরপ্রসারী ছিলো যে, নিছক সংস্কারের পথে তার প্রতিকার সম্ভব হলো না; উপরন্তু তা' পরিণতি লাভ করলো স্বার্থশংশ্লিষ্ট দলসমূহের মধ্যকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে। সত্যিকার সংস্কারের পরিবর্তে খৃষ্টধর্মকে বিতাড়িত করা হলো আত্মরক্ষার পথে এবং ধীরে ধীরে তাকে কৈফিয়তের মনোভাব অবলম্বন করতে বাধ্য করা হলো। ক্যাথলিক বা প্রোটেষ্টান্ট কোনো গীর্জাই তার মানসিক দড়াবাজী (acrobatics), তার অবোধ্য মতবাদসমূহ, দুনিয়ার

www.pathagar.com

প্রতি তার অবজ্ঞা, সাধারণ নির্যাতিত মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে ক্ষমতা ভোগীদের অবিবেচনা প্রসূত সমর্থন ত্যাগ করলো না; এই সব গুরুতর ভুলকে ঢাকা দিয়ে সে চেষ্টা করতে লাগলো, শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা উড়িয়ে দিতে। সুতরাং দশকের পর দশক, শতকের পর শতক যতোই এগিয়ে যেতে লাগলো, ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব ইউরোপে ততোই দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়ে চললো। অবশেষে আঠারো শতকে ফরাসী বিপ্লব ও অন্যান্য দেশের তার সাংস্কৃতিক প্রভাব গীর্জার আধিপত্য পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিলো।

এ-সময়ে আবার মনে হলো, যেনো মধ্যযুগীয় অতি সূক্ষ্ম ধর্মমতের স্বেচ্ছাচারিতার অন্ধকার-মুক্ত একটা নতুন আত্মিক সভ্যতার বিকাশের সম্ভাবনা ইউরোপে তখনো রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আঠারো শতকের শেষ ভাগে ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আমরা দর্শন, কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতিপয় শ্রেষ্ঠ ও আত্মিক দিক দিয়ে অতি শক্তিশালী ইউরোপীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব দেখতে পাই। কিন্তু জীবনের এই আত্মিক ও ধর্মীয় ধারণা ছিলো কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইউরোপের বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ দীর্ঘকাল ধর্মীয় মতবাদের কারাগারে আবদ্ধ থেকে মানুষের স্বাভাবিক প্রচেষ্টার সাথে সব সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছিলো। তাই একবার শৃংখলমুক্ত হ'য়ে তারা আর ধর্মীয় সংগঠনের দিকে পা বাড়াতে রাজী হলো না।

সম্ভবতঃ যীশুখৃষ্টকে আল্লাহর পুত্র হিসাবে পেশ করার প্রচলিত ধারণাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিগত কারণ, যা' ইউরোপের ধর্মীয় পুনরুত্থানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। দার্শনিক মনোভাব সম্পন্ন খৃষ্টানরা অবশ্যি এই পুত্রদের ধারণাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন নি; এ দিয়ে তাঁরা বুঝেছেন মানব-রূপে আল্লাহর করুণার প্রকাশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রত্যেকেরই তো আর দার্শনিক মন নেই! খৃষ্টানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে 'পুত্র' কথাটির অতি প্রত্যক্ষ অর্থ ছিলো ও রয়েছে, যদিও তার মধ্যে সব সময়েই একটা ভাববাদী গন্ধ লেগে আছে।

www.pathagar.com

যীশুখৃষ্টের আল্লাহর পুত্র হওয়ার মানবরূপ গ্রহণের ধারণার দিকে, যেনো আল্লাহ শ্বেত-প্রবাহমান-শ্মশ্রুধারী করুণাময় বৃদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছেন; এবং অসংখ্য বিখ্যাত শিল্পীর তুলিতে অংকিত এই রূপ ইউরোপীয় মানুষের অবচেতন মনের ওপর চিরন্তন দাগ কেটে রয়েছে। যখন গীর্জার প্রচারিত মতবাদের আধিপত্য ইউরোপের ওপর সর্বোপরি প্রচলিত ছিলো, তখন এই বিচিত্র ধারণা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের প্রবণতা দেখা যায়নি। কিন্তু যখন মধ্যযুগীয় বুদ্ধির শৃংখলা একবার ভাঙ্গলো, তখন ইউরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মানব-আকৃতি বিশিষ্ট পিতৃরূপী ঈশ্বরের সাথে আপোষ করতে পারলেন না পক্ষান্তরে, আল্লাহর এই মানবরূপ গ্রহণের ধারণা আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দেখা দিলো। এক আলোকের যুগ অতিক্রমণের পর ইউরোপীয় চিন্তানায়করা আল্লাহর ধারণা সম্পর্কে গীর্জার শিক্ষার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেনঃ এবং যেহেতু এই একমাত্র ধারণায়ই তারা অভ্যস্ত ছিলেন, তাই তারা আল্লাহর অস্তিত্বের ধারণাকে এবং সাথে সাথে ধর্ম সম্পর্কিত ধারণাকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করলেন।

এছাড়াও শিল্পায়নের নতুন যুগ তার সাথে নিয়ে এলো গৌরবময় বাস্তব অগ্রগতির চাকচিক্য এবং তা' মানুষের মনোযোগ অন্য দিকে আকৃষ্ট করে ইউরোপের ধর্মীয় ক্ষেত্রে আরো বেশী করে শূন্যতা সৃষ্টির সহায়তা করলো। এই শূন্যতার মাঝখানে পশ্চিমী সভ্যতার বিকাশ এক মর্মান্তিক পরিণতির দিকে আবর্তন করলো-এ আবর্তন তাদেরই দৃষ্টিতে মর্মান্তিক, যারা ধর্মকে ধরে নিয়েছে মানব-জীবনের বলিষ্ঠতম বাস্তবতা হিসেবে খৃষ্টধর্মের পূর্বতন গোলামীর শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য মন সীমানা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে ক্রমাগত মানুষের যে কোনো প্রকার আত্মিক দাবীর বিরোধিতার দিকে পা বাড়ালো। পুনর্বার আত্মিক আধিপত্যের দাবীদার শক্তিসমূহের চাপে কোণঠাসা হওয়ার অবচেতন ভীতির দরুন ইউরোপ নীতি ও কর্মের দিক দিয়ে যে কোনো

www.pathagar.com

ধর্মবিরোধিতার অগ্রনায়ক হয়ে ওঠলো। সে প্রত্যাবর্তন করলো তার প্রাচীন রোমান ঐতিহ্যরই পথে।

অন্যান্য ধর্মের ওপর খৃষ্টধর্মের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্বই যে পাশ্চাত্য দেশসমূহকে তাদের গৌরবময় বাস্তব অগ্রগতির অধিকার দান করেনি, কেউ এরূপ মতবাদ প্রকাশ করলে তাকে দোষ দেয়া যায় না' কারণ খৃষ্টীয় গীর্জার প্রচারিত নীতির বিরুদ্ধে ইউরোপের ঐতিহাসিক বুদ্ধিবৃত্তির সংগ্রাম ব্যতীত এ কৃতিত্বে চিন্তা করাও অসম্ভব। যে খৃষ্টীয় 'আধ্যাত্মিকতা' জীবনের স্বাভাবিক সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিলো, জীবন সম্পর্কে ইউরোপের বর্তমান জড়বাদী ধারণা তার ওপর ইউরোপের নির্মম প্রতিশোধ।

খৃষ্টধর্ম ও আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার মধ্যকার ঘরোয়া সম্পর্কের গভীরতর আলোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু এখানে দেখাতে চেষ্টা করেছি তিনটি কারণ–সম্ভবতঃ তিনটি প্রধান কারণ, কেন সে সভ্যতা তার ধারণা ও কর্মপদ্ধতির দিক দিয়ে এতো ব্যাপকভাবে ধর্মবিরোধী। এক কারণ হচ্ছে, মানব–জীবন ও তার অন্তর্নিহিত মূল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ জড়বাদী মনোভাব সহ রোমান সভ্যতার ঐতিহ্য, অপর কারণ, বাস্তব দুনিয়ার প্রতি খৃষ্টীয় ধর্মমতের উপেক্ষা এবং মানুষের স্বাভাবিক আকাংখা ও ন্যায়সংগত প্রচেষ্টা দমনের (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগীদের সাথে গীর্জার চিরাচরিত মৈত্রী এবং ক্ষমতাভোগীদের উদ্ভাবিত যে–কোনো শোষণের ক্ষেত্রে তার নির্মম সমর্থন সহ্য করার) বিরুদ্ধে মানব প্রকৃতির বিদ্রোহ এবং সর্বশেষে, আল্লাহর মানবরূপে আত্মপ্রকাশের ধারণা। ধর্মের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলো–এতোটা সফল হয়েছিল যে, বিভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায় এবং গীর্জাসমূহও ইউরোপের পরিবর্তিত সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত অবস্থার সংগে তাদের মতামতকে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ধর্মের প্রাথমিক শর্ত অনুযায়ী অনুগামীদের সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত ও রূপায়িত করার পরিবর্তে খৃষ্টধর্ম নিজকে একটা

www.pathagar.com

মেনে নেওয়া রীতি ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ছদ্মাবরণের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। জনসাধারণের কাছে তার রয়েছে নিছক আনুষ্ঠানিক অর্থ, যেমন ছিলো সেকালের রোমান দেবদেবীদের। সমাজের ওপর তার কোনো বাস্তব প্রভাব ছিলো না এবং থাকতেও দেয়া হতো না। নিঃসন্দেহে পশ্চিম দেশে এখনো এমন বহু ব্যক্তি আছেন, যারা ধর্মীয় ধারায় অনুভব করেন, চিন্তা করেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করেন তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সভ্যতার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে, কিন্তু তারা হচ্ছেন ব্যতিক্রম মাত্র। গণতন্ত্রী অথবা ফ্যাসিষ্ট, পুঁজিবাদী অথবা বোল্‌শেভিক, দিন-মজুর অথবা বুদ্ধিজীবী-পাশ্চাত্যের যে-কোনো সাধারণ বাসিন্দা জানে শুধু একমাত্র সঠিক ধর্ম, এবং তা' হচ্ছে বস্তুবাদী অগ্রগতির পূজা; তার বিশ্বাস, জীবনকে ক্রমাগত সহজতর করে তোলা ছাড়া জীবনের আর কোনো লক্ষ্য নেই, অথবা আরো চলতি কথায় 'প্রকৃতি নিরপেক্ষ' (independent of Nature) হওয়াই হচ্ছে তার ধর্ম। বিরাট বিরাট কারখানা, সিনেমা, রাসায়নিক গবেষণাগার, নৃত্যকলাভবন, জলবিদ্যুতকেন্দ্র হচ্ছে তার ধর্ম মন্দির; আর তার পুরোহিত হচ্ছে ব্যাংকার, ইঞ্জিনিয়ার অভিনেতা-অভিনেত্রী, শিল্পপতি-বৈমানিক। ক্ষমতা ও আনন্দের এই নেশার অপরিহার্য পরিনাম হয়েছে যখন তখন যেখানে সেখানে স্বার্থের সংঘাতের ফলোদ্ভুত সশস্ত্র দ্বন্দ্ব। আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর ফল হচ্ছে এমন এক ধরণের মানুষ সৃষ্টি, যাদের নীতিবোধ নিছক উপযোগবাদের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ এবং যার ভালোমন্দের মাপকাঠি হচ্ছে একমাত্র বস্তুবাদী সাফল্য।

পশ্চিমের সামাজিক জীবনে বর্তমানে যে নিগুঢ় রূপান্তর আসছে, তাতে দিনের পর দিন উপযোগবাদী নীতিবোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। কারিগরী যোগ্যতা, দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদী দলীয় বোধের মতো বস্তুবাদী সমাজ কল্যাণের সাথে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্ট সকল দিককে দেওয়া হচ্ছে উচ্চ মর্যাদা এবং কখনো কখনো তার মূল্য অহেতুক অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে; সন্তান বাৎসল্য বা যৌন বিশ্বস্ততার মতো যে সব

www.pathagar.com

গুণকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত নিছক নৈতিক দৃষ্টিভংগিতে বিচার করা হতো, তাদের গুরুত্ব দ্রুত লোপ পেয়ে যাচ্ছে, কারণ সমাজের ওপর তাদের কোনো নির্দিষ্ট বস্তুবাদী কল্যাণ দেখা যাচ্ছে না। শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য বলিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধনের চূড়ান্ত প্রয়োজন অনুভূত হতো যে যুগে, আধুনিক পাশ্চাত্যে তার স্থান অধিকার করছে ব্যাপকতর শিরোনামযুক্ত এক নতুন সমাজ-সংহতির যুগ। যে সমাজ অপরিহার্যরূপে শিল্প-বিজ্ঞান-প্রভাবিত এবং যা' দ্রুত ক্রমবর্ধমান গতিতে নিছক যান্ত্রিক ধারায় গড়ে উঠেছে, সেখানে পিতার প্রতি পুত্রের আচরণের কোনো বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব থাকতে পারে না, যতোক্ষণ ব্যক্তি বিশেষ তার আচরণে পারস্পরিক সংযোগ সম্পর্কে সমাজের নির্ধারিত সাধারণ শালীনতার সীমার মধ্যে থেকে কাজ করে। ফলে পাশ্চাত্যের পিতা প্রতিদিন পুত্রের ওপর তার কর্তৃত্ব ক্রমাগত হারিয়ে ফেলেছে এবং সম্পূর্ণ ন্যায়সংগতভাবে পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারাচ্ছে। যে যান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত প্রবণতা রয়েছে ব্যক্তি বিশেষের ওপর অপরের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা লোপ করার, তার বিধান তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করছে, এবং প্রকৃতপক্ষে তাকে অচল করে দিচ্ছে, কারণ উপরোক্ত ধারণার ন্যায়সংগত বিকাশের খাতিরে পারিবারিক সম্পর্কের সুযোগ-সুবিধাও লোপ পেতে বাধ্য।

এরই সাথে সাথে সমান্তরালভাবে চলেছে 'প্রাচীন' যৌন নীতিবোধের ক্রমাগত ভাঙ্গন। আধুনিক পাশ্চাত্যে যৌন বিশ্বস্ততা ও শৃংখলা দ্রুত অতীতের কাহিনীতে পর্যবসিত হচ্ছে, কারণ এ সব গুণ প্রধানতঃ ধর্মনীতির প্রেরণায় জন্মলাভ করেছিলো; এবং সমাজের বস্তুবাদী কল্যাণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিবেচনার কোনো নির্দিষ্ট অব্যবহিত প্রভাব নেই। সুতরাং যৌন সম্পর্কের শৃংখলা দ্রুত হারিয়ে ফেলছে তার গুরুত্ব এবং তার স্থান অধিকার করছে এক নতুন নীতিবোধ যাতে মানব-দেহের অসংযত ব্যক্তি স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে

www.pathagar.com

যৌন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র জনসংখ্যা ও সুপ্রজননের প্রশ্ন বিবেচনায়।

কি করে ওপরে বর্ণিত ধর্মবিরোধী বিবর্তন ধারা সোভিয়েত রাশিয়ায় তার স্বাভাবিক চরম রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার আলোচনা এখানে অপ্রাসংগিক হবে না। রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগতের অবশিষ্টাংশ থেকে অপরিহার্যরূপে স্বতন্ত্রভাবে তার বিকাশ হয়নি। পক্ষান্তরে, মনে হয় যে, কমিউনিষ্ট পরীক্ষা (experiment) আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার স্বীকৃত ধর্মবিরোধী এবং পরিণামে আধ্যাত্মিকতা বিরোধী প্রবণতার পরিণতি ও পূর্ণতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমনও হতে পারে যে, পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য ও কমিউনিজমের মধ্যে বর্তমান তীব্র বিরোধের একমাত্র কারণ মূলের দিক দিয়ে হয়তো এই যে, দু'টি অপরিহার্যরূপে সমান্তরাল আন্দোলন তাদের সাধারণ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে স্বতন্ত্র গতিতে। ভবিষ্যতে তাদের আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য নিশ্চিতরূপে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠবে কিন্তু এখনো পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম উভয়ের মধ্যে 'সমাজ' নামে অভিহিত এক সমষ্টিগত যন্ত্রের নির্জল বস্তুবাদী প্রয়োজনের কাছে মানুষের আত্মিক ব্যক্তিত্ব ও নীতিবোধকে বলি দেবার মৌলিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে ব্যক্তি হচ্ছে সমাজচক্রের একটি দাঁতের মতো।

একমাত্র সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, এই ধরণের সভ্যতা ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যে কোন সাংস্কৃতির পক্ষে মারাত্মক বিষের মতো হতে বাধ্য। ইসলামী চিন্তাধারা অবলম্বন করা এবং পশ্চিমী সভ্যতার বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করা অথবা বিপরীত অবস্থা সম্ভব কিনা, আমাদের এই মূল প্রশ্নের জবাব অবশ্যই নেতিবাচক। ইসলামে সর্ব প্রথম ও সর্বপ্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের নৈতিক অগ্রগতি, সুতরাং ধর্মীয় বিবেচনা সেখানে নিছক উপযোগবাদী বিবেচনার ওপর প্রাধান্য লাভ করবেই। আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার ক্ষেত্রে অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। সকল মানবীয় কার্যকলাপের ওপর

www.pathagar.com

আধিপত্য করছে বস্তুবাদী উপযোগিতার বিবেচনা এবং ধর্মীয় নীতিবাদকে নিক্ষেপ করা হয়েছে জীবনের পশ্চাদ্দেশে। সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তারের সকল ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে নীতিবাদকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে নিছক পুঁথিগত অস্তিত্বে। এরূপ অবস্থায় ধর্মীয় নীতিবাদের আলোচনা মোনাফেকী ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার সামাজিক পরিণাম সম্পর্কে কল্পনা করতে গিয়ে লোকোত্তর ধর্মীয় নীতিবাদের উল্লেখ না করলে তা' সংগতই বিবেচিত হয়। যারা অপেক্ষাকৃত কম শালীনতা সম্পন্ন এবং যারা নৈতিক মনোভাবের দিক দিয়ে কম স্পষ্ট, তাদের কাছে লোকোত্তর ধর্মীয় নীতিবাদ চিন্তাধারার অযৌক্তিক দিক হিসাবে গৃহীত হয় অনেকটা তেমনি করে, যেমন কোনো গণিত শাস্ত্রবিদ এমন কতগুলো 'অযৌক্তিক' রাশি নিয়ে কাজ করে যান, যার কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই, অথচ মানব-মনের মৌলিক অসামর্থ্য হেতু কল্পনার শূণ্যস্থান পূরণের জন্য তার প্রয়োজনও থাকে।

ধর্মীয় নীতিবাদের প্রতি এমনি পাশ-কাটানো মনোভাব কোনো ধর্মীয় আবর্তনের ক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে অসামঞ্জস্য; সুতরাং ইসলামের সাথে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার নৈতিক ভিত্তির কোনো সামঞ্জস্য নেই।

এই অবস্থা সঠিক এবং ফলিত বিজ্ঞানের (exact and applied science) ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য থেকে মুসলমানদের বিশেষ প্রেরণা লাভে বাধা দেয় না; কিন্তু সেখানেই তাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের শুরু ও শেষ হওয়া প্রয়োজন। আরো অগ্রসর হয়ে মূলের দিক দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার, তার জীবন-পদ্ধতি ও সামাজিক সংগঠনের অনুকরণ করা ধর্মীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও বাস্তব ধর্ম ইসলামের অস্তিত্বের মূলে মারাত্মক আঘাত হানা ব্যতীত অসম্ভব।

www.pathagar.com

ক্রুসেডের প্রতিচ্ছায়া

আত্মিক অসামঞ্জস্যের প্রশ্ন সম্পূর্ণ বাদ দিলেও আর একটি কারণ রয়েছে, যার জন্য মুসলমানদের পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণে বিরত থাকা উচিত। কারণটি হচ্ছে; পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ইসলামের বিরুদ্ধে এক অদ্ভুদ দুশমনীর রঙে রঞ্জিত।

এও হচ্ছে কতকটা ইউরোপের অতীতেরই উত্তরাধিকার। গ্রীক ও রোমানরা কেবল নিজেদেরকেই 'সুসভ্য' মনে করতো; তাই তারা যা কিছু বিদেশী, বিশেষ করে যা' কিছু ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলের সাথে সংশ্লিষ্ট, তার ওপর বর্বর মার্কা লাগিয়ে দিয়েছিলো। তখন থেকে পাশ্চাত্যের বাসিন্দাদের মধ্যে দৃঢ় বদ্ধমূল বিশ্বাস রয়েছে যে, মানব জাতির অবশিষ্টাংশ থেকে তাদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব একটি সঠিক সত্য; এবং ইউরোপীয় ব্যতীত অন্যান্য বর্ণ ও জাতির প্রতি কম বেশী করে বিঘোষিত অবজ্ঞা পশ্চিমী সভ্যতার স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের অন্যতম।

অবশ্যি ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমী সভ্যতার মনোভাব বিশ্লেষণ করতে এই একটি কারণের উল্লেখই যথেষ্ট নয়। অনান্য বিদেশী ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি পাশ্চাত্যের যে ঔদাসীন্যমূলক অসমর্থনের মনোভাব রয়েছে, এ ক্ষেত্রে এবং কেবল এ ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম; ইসলামের বিরুদ্ধে রয়েছে তার দৃঢ় বদ্ধমূল ও গোড়ামী প্রসূত বিদ্বেষ এবং তা' কেবল বুদ্ধিবৃত্তি–সংক্রান্ত নয়, তার মধ্যে আছে একটা তীব্র প্রবণতা। ইউরোপ বৌদ্ধ ধর্ম বা হিন্দু দর্শনকে মেনে না নিতে পারে, তবু এ সকল পদ্ধতি সম্পর্কে সে ভারসাম্যযুক্ত চিন্তামূলক মনোভাব বজায় রেখে চলে। কিন্তু যখনই ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে, তখন সকল ভারসাম্য হারিয়ে যায় এবং বিদ্বেষ প্রবণতা দেখা দেয়। অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদই ইসলাম সম্পর্কিত রচনায় অবৈজ্ঞানিক

www.pathagar.com

পক্ষপাত দোষের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা গেছে, যেনো ইসলামকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তু বলেও ধরা যায় না বরং তাকে ধরে নেওয়া হয় বিচারকের সম্মুখে দন্ডায়মান আসামী হিসেবে। কোনো প্রাচ্যবিদ দন্ডাদেশ আদায়ের জন্য বদ্ধপরিকর পাবলিক প্রসেকিউটরের কার্য করে যান; কোনো কোনো ব্যক্তি আবার তার মোয়াক্কেলকে ব্যক্তিগতভাবে দোষী সাব্যস্ত করে নিয়ে আসামীর পক্ষ সমর্থনে আধা-আন্তরিকতা সহকারে অবস্থা বিশ্লেষণ করেন। অধিকাংশ প্রাচ্যবিদের অনুমান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি মধ্যযুগে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক গীর্জার প্রতিষ্ঠিত ইনকুইজিশন আদালতের কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, অর্থাৎ তারা খোলা মন নিয়ে কখনো ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান করেন না, বরং পূর্বনির্ধারিত বিদ্বেষমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রত্যেকটি বিষয়ের বিচার করতে শুরু করেন। পূর্বেই তারা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার ইচ্ছা করে বসে আছেন, তদনুসারেই তারা সাক্ষ্য নির্বাচন করে নেন। যেখানে মতলব মাফিক সাক্ষী নির্বাচন অসম্ভব হয়, সেখানে তারা অপ্রাসংগিক বলে প্রাপ্ত সাক্ষ্যের অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে বিচার করেন অথবা অপর পক্ষের অর্থাৎ মুসলমানদের নিজের প্রকাশিত মতের ওপর কোনো গুরুত্ব আরোপ না করে অবৈজ্ঞানিক ঈর্ষাপরায়ণতার মনোভাব নিয়ে তাদের যবানবন্দী বিশ্লেষণ করেন।

এই পদ্ধতির ফল হচ্ছে আমাদের সামনে উপস্থিত পশ্চিমী প্রাচ্যবাদী সাহিত্যে ইসলাম ও যে কোনো ইসলামী বিষয়ের বিচিত্ররূপ বিকৃত চিত্র। এই বিকৃত কোনো বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ নয়; ইংল্যান্ডে ও জার্মানীতে, রাশিয়া ও ফ্রান্সে, ইতালী ও হল্যান্ডে-সোজা কথায়, যেখানেই ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরা ইসলামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেখানে এ একই অবস্থা দেখা যায়। মনে হয়, যখনই ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিকূল সমালোচনার বাস্তব অথবা কল্পিত সুযোগ পাওয়া যায়, তখনই তারা এক বিদ্বেষের আনন্দে মত্ত হয়ে ওঠেন। যেহেতু ইউরোপীয়

www.pathagar.com

প্রাচ্যবিদরা নিজেরা এক আলাদা জাতি নন, বরং তারা হচ্ছেন তাদের সভ্যতা ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতারই নিছক সমর্থক, তাই প্রয়োজনের খাতিরে আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয় যে, ইউরোপীয় মন সমগ্রভাবে যে কোনো কারণে ধর্ম ও সংস্কৃতি হিসেবে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। এর অন্যতম কারণ হতে পারে সেই প্রাচীন মতবাদ, যা সারা দুনিয়াকে ইউরোপীয় ও বর্বর দুই ভাগে বিভক্ত করে দেখে এবং ইসলামের সাথে অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট আর একটি কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে অতীতে, বিশেষ করে মধ্য যুগের ইতিহাসে।

একদিকে সম্মিলিত ইউরোপ ও অপর দিকে ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম বৃহৎ সংঘর্ষ ক্রুসেড ঘটেছিলো ইউরোপীয় সভ্যতার প্রারম্ভের একই সময়ে। সে যুগে তখনো গীর্জার সাথে সংশ্লিষ্ট এই সভ্যতা রোমের পতনের পরবর্তী কতিপয় অন্ধকার শতাব্দী পার হয়ে কেবল আপনার পথ খুঁজতে শুরু করেছিলো। তার সাহিত্য তখন সবেমাত্র এক নতুন আত্মবিকাশের পর্যায় অতিক্রম করে চলেছে। তার ললিত-কলা গথ, হুন ও আরবদের যুদ্ধকালীন দেশান্তরের পরবর্তী জড়তা কাটিয়ে ধীরে ধীরে জেগে ওঠেছে, ইউরোপ তখন সবেমাত্র মধ্য যুগের প্রারম্ভিক অপরিপক্ক অবস্থা থেকে মাথা তুলছে, সে তখন লাভ করছে এক নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা ও তারই মাধ্যমে লাভ করছে এক ক্রমবর্ধমান স্পর্শকাতরতা। ঠিক এই সংকট সন্ধিক্ষণে ক্রুসেড তাকে দাঁড় করিয়ে দিলো ইসলামী জাহানের সাথে এক তীব্র সংঘর্ষের মুখোমুখী করে। অবশ্য ক্রুসেডের যুগের আগেও মুসলিম ও ইউরোপীয়দের মধ্যে সংগ্রাম চলেছে, সিসিলি ও স্পেনে আরবরা বিজয় লাভ করেছে এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের ওপর তাদের আক্রমণ চলেছে। কিন্তু এসব যুদ্ধ ঘটেছে ইউরোপের সাংস্কৃতির নবচেতনা লাভের পূর্বে এবং অন্ততঃ ইউরোপীয় দৃষ্টিভংগীতে তখনকার দিনে তা সীমাবদ্ধ ছিলো স্থানীয় সমস্যায় এবং তার সকল দিকের গুরুত্ব তখন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। ক্রুসেডই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ঘটনা, যা'তে পরবর্তী বহু শতাব্দীর জন্য ইসলামের প্রতি

www.pathagar.com

ইউরোপের মনোভাব নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিলো। ক্রুসেডের ফল ছিলো চূড়ান্ত, কারণ তা ঘটেছিলো ইউরোপের শৈশব যুগে এমন এক কালে, যখন তার বিচিত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিজস্ব দাবী প্রতিষ্ঠা করছে এবং তখনো তার গঠনের ধারা চলছে। ব্যক্তির মতো জাতির জীবনেও প্রাথমিক শৈশবে অর্জিত ধারণার দাগ সচেতন বা অবচেতনভাবে তার পরবর্তী জীবনেও অক্ষয় হয়ে থাকে। এমনি সব ধারণা মনের ওপর এমন গভীরভাবে দাগ কেটে থাকে যে, পরবর্তী অধিকতর চিন্তা প্রবণতা ও স্বল্পতার আবেগ প্রবণতার বয়সে পৌঁছেও তার প্রভাব দূর করা হয়ে পড়ে দুরূহ এবং তা' সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয় না কখনো। ক্রুসেডের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিলো। ইউরোপের গণমানসের ওপর তার গভীরতম ও চিরস্থায়ী ধারণার দাগ দৃঢ়বদ্ধমূল হয়ে বসে। তখনকার দিনে এই ঘটনাবলী তাদের মধ্যে যে সার্বজনীন উদ্যম জাগিয়ে তোলে ইউরোপে এর আগেকার কোনো ঘটনার সাথেই তার তুলনা করা চলে না এবং পরবর্তী আমলের ঘটনাবলীর মধ্যেও তেমন কিছু দেখা যায় না। সমগ্র মহাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেলো এক মাদকতার তরংগ, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য সকল রাষ্ট্র, জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে চলতি বাধার প্রাচীর অতিক্রম করে গেলো এক বিচিত্র বিজয়োল্লাস। তখনই ইতিহাসে সর্বপ্রথম ইউরোপ নিজকে উপলব্ধি করলো এক অখন্ড ঐক্য হিসেবে– ইসলামী জাহানের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল ঐক্য হিসেবে। অসংগত অতিরঞ্জন না করেই আমরা বলতে পারি যে, আধুনিক ইউরোপ জন্মলাভ করেছে ক্রুসেডের ভাবধারা থেকে। তার আগে অস্তিত্ব ছিলো য়্যাংলো– স্যাকসন ও জার্মানদের, ফরাসী ও নর্মানদের ইতালীয় ও দিনেমারদের; কিন্তু ক্রুসেডের আমলে সকল ইউরোপীয় জাতির কাছে সমভাবে সাধারণ লক্ষ্য 'পশ্চিমী সভ্যতার' নতুন ধারণা জন্ম লাভ করলো, এবং ইসলাম বিদ্বেষই এই নব সৃষ্টির পশ্চাতে ধর্ম পিতা হয়ে দাঁড়ালো।

এ হচ্ছে ইতিহাসের অন্যতম মহাপরিহাস যে, খৃষ্টীয় গীর্জার পরিপূর্ণ ও কুণ্ঠাহীন সমর্থন প্রাপ্ত ধারণাকে মূলধন করে সর্বপ্রথম

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য জগতের সামগ্রিক চেতনা তথা তার বুদ্ধিবৃত্তিগত সংগঠন সম্ভব হয়েছিলো, অথচ পশ্চিমের পরবর্তী কৃতিত্ব সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র গীর্জার অতীত ও বর্তমানের প্রচারিত যে কোনো ধারণার বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিগত বিদ্রোহেরই মাধ্যমে। খৃষ্টীয় গীর্জা ও ইসলাম উভয়ের দৃষ্টিকোণ হতেই এ এক মর্মান্তিক পরিণতি। গীর্জার পক্ষে এই কারণে মর্মান্তিক যে, এমন একটা চমকপ্রদ প্রারম্ভিক সূচনা সত্ত্বেও সে ইউরোপীয় মনের ওপর থেকে তার প্রভাব হারিয়ে ফেলেছে। আর ইসলামের জন্য মর্মান্তিক এই কারণে যে, পরবর্তী দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাকে বহু রূপে ও ছদ্ম আবরণে ক্রুসেডের অগ্নিজ্বালা সহ্য করতে হয়েছে।

ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান নাইটরা যে সব ইসলামী দেশ জয় করে পরে হারিয়েছেন, সেখানে তারা অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতা সহকারে ধ্বংস ও অবমাননার যে নির্মম লীলা চালিয়েছেন, তাতেই পূর্ব ও পশ্চিমের সম্পর্ক বরাবরের জন্য তিক্ত করার মতো যুগযুগান্তব্যাপী দুশমনীর বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হয়েছে। অন্যথায় এই ধরণের মনোভাবের কোনো মৌলিক প্রয়োজন ছিলো না। আত্মিক বুনিয়াদ ও সামাজিক লক্ষ্যের দিক দিয়ে ইসলামী ও পশ্চিমী সভ্যতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও নিশ্চয়ই তাদের পরস্পরকে সহ্য করতে এবং উভয়ের পাশাপাশি বন্ধুত্বমূলক সংযোগের মধ্যে বাস করতে পারা উচিত ছিলো। কেবল কাগজপত্রে নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও এমনি একটা সম্ভাবনা ছিলো। মুসলিম তরফে সব সময়েই পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও সম্মান প্রদর্শনের আন্তরিক ইচ্ছা ছিলো। খলিফা হারুনুর রশীদ যখন সম্রাট শার্লামেনের কাছে তাঁর দূত পাঠিয়েছিলেন, তখন এই ইচ্ছা দ্বারাই তিনি চালিত হয়েছিলেন, ফরাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করে কোনো বাস্তবতা লাভ করবার ইচ্ছা তার ছিলো না ইউরোপ তখনো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এতোটা আদিম অবস্থায় ছিলো যে, এই সুযোগের পূর্ণ উপলব্ধি তার পক্ষে সম্ভব ছিল না; কিন্তু নিশ্চয়ই সে তাতে অপসন্দ প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে

www.pathagar.com

ক্রুসেডের আবির্ভাবে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে গেলো। এর কারণ এ নয় যে, তারা যুদ্ধই চেয়েছিলো; মানব-ইতিহাসে জাতিসমূহের মধ্যে বহু যুদ্ধ ঘটেছে এবং তা বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হয়েছে এবং বহু শত্রুতা বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু ক্রুসেডের কুফল অস্ত্রের ঝনঝনায় সীমিত থাকেনি; তা' ছিলো প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ বুদ্ধিবৃত্তিগত। সে কুফল ফলেছিলো ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে গীর্জার পোষিত মিথ্যা ধারণার স্বেচ্ছাকৃত প্রচারের ফলে মুসলিম জাহানের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় মনকে বিষাক্ত করার মধ্য দিয়ে। ক্রুসেডের সময়েই ইসলাম অমার্জিত ইন্দ্রিয়পরতা ও পাশব হিংসার ধর্ম, আত্মিক শোধনের পরিবর্তে অনুষ্ঠান পালনের ধর্ম বলে একটা উপহাসজনক ধারণা ইউরোপীয় মনে প্রবেশ করে স্থায়ী হয়ে থাকলো, এবং তখনই সর্বপ্রথম রসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে ইউরোপে ম্যাহাউন্ড (Mahound) নামে অভিহিত করা হলো। বিদ্বেষের বীজ বপন করা হলো। ক্রুসেডের উদ্দীপনা ইউরোপের অন্যত্র তার ফল প্রসব করলো, স্পেনের খৃষ্টানরা বিধর্মীদের আধিপত্য থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠলো। মুসলিম স্পেনের ধ্বংস সাধন করতে কয়েক শতাব্দী লেগেছিলো। কিন্তু মোটের ওপর এই দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের কারণেই ইউরোপের ইসলাম বিরোধী মনোভাব গভীরতর হলো এবং স্থায়ীভাবে শিকড় গাড়লো। এর ফলে হিংস্রতম ও নির্মমতম নির্যাতনের পর স্পেনের মুসলিম শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করা হলো এবং পরম উল্লাসে সমগ্র ইউরোপে তার বিজয় উৎসব পালিত হলো-যদিও তার পরিণাম হয়েছিলো এক সর্বাধিক গৌরবময় সংস্কৃতির ধ্বংস এবং মধ্যযুগীয় অজ্ঞতা ও অপরিপক্কতা দ্বারা তার পরিত্যক্ত শূন্যস্থান পূরণ।

স্পেনের ঘটনা প্রবাহের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার আগেই এক গভীর গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় ঘটনা পাশ্চাত্য জগত ও ইসলামের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাহত করলো। ঘটনাটি হলো তুর্কীদের হাতে কনষ্টান্টিনোপলের পতন। ইউরোপের দৃষ্টিতে তখনো প্রাচীন গ্রীক ও

www.pathagar.com

রোমান গৌরবের কিছুটা অংশ বাইজেন্টিয়ামের ওপর অবশিষ্ট ছিলো এবং তাকে তারা মনে করতো এশিয়ার 'বর্বরদের' বিরুদ্ধে ইউরোপের আত্মরক্ষার প্রাচীর। তার পতনের ফলে মুসলিম ঝঞ্ঝা- প্রবাহের সামনে ইউরোপের তোরণদ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেলো। পরবর্তী যুদ্ধবিগ্রহ সংকুল কয়েক শতাব্দীতে ইসলামের বিরুদ্ধে ইউরোপের দুশমনী সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকলো না, বরং রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে তীব্রতর হয়ে উঠলো।

সব কিছু মিলিয়ে এই সব সংঘাতের ভিতর দিয়ে ইউরোপ যথেষ্ট লাভ করে গেলো। রেনেসাঁ -ইসলামী, বিশেষ করে আরব্য উৎস থেকে ব্যাপকভাবে ধারণ করা উপাদান নিয়ে ইউরোপীয় কলা ও বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ ছিলো বহুলাংশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সংযোগের ফল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামী জাহানের চাইতে বহু গুণে বেশী লাভ করলো ইউরোপ, কিন্তু সে কখনো ইসলামের প্রতি চিরাচরিত বিদ্বেষ হ্রাস করে মুসলিমদের নিকট তার চিরন্তন ঋণ স্বীকার করলো না। পক্ষান্তরে সময়ের সাথে সাথে সে বিদ্বেষ আরো বেড়ে গেলো এবং ক্রমে তা' দৃঢ়বদ্ধমূল রীতিতে রূপ লাভ করলো। 'মুসলিম' শব্দটি উচ্চারিত হলেই জনসাধারণের মনোভাব বিদ্বেষে আচ্ছন্ন হতো। মুসলিম বিদ্বেষ জনগণের মধ্যে চলতি প্রবাদে পরিণত হলো, প্রতিটি ইউরোপীয় নর-নারীর অন্তরে তা' অনুপ্রবিষ্ট করানো হলো। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ভিতরে এ বিদ্বেষ বেঁচে থাকলো। সংস্কারের (Reformation) যুগ এলো, ধর্মীয় বিরোধ ইউরোপকে বহুধা বিভক্ত করলো এবং এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলো; কিন্তু ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ সর্বক্ষেত্রেই সাধারণ হয়ে রইলো। এমন একটা সময় এলো, যখন ইউরোপ থেকে ধর্মীয় মনোভাব বিলুপ্ত হতে শুরু করলো; কিন্তু ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পূর্ববৎ থেকে গেলো। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, আঠারো শতকে খৃষ্টধর্ম ও গীর্জার দুর্দান্ত শত্রুদের

www.pathagar.com

অন্যতম ফরাসী দার্শনিক-কবি ভোল্টেয়ার একই সময়ে ছিলেন ইসলাম ও রাসূলে করীমের প্রতি গোড়া বিদ্বেষ পোষণকারী। কয়েক দশক পরে এমন এক সময় এলো, যখন পাশ্চাত্য সুধী ব্যক্তিগণ বিদেশী সংস্কৃতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে ও সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করতে শুরু করলেন; কিন্তু ইসলামের বেলায় চিরাচরিত বিদ্বেষ তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে যুক্তিহীন পক্ষপাত হিসাবে প্রবেশ করলো এবং ইউরোপ ও ইসলামী জাহানের মধ্যে যে ইতিহাস সাংস্কৃতিক সমুদ্রের ব্যবধান রচনা করেছিলো, তার মধ্যে সেতুবন্ধন আর হলো না। ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা ইউরোপীয় চিন্তাধারার অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছিলো। একথা সত্যি যে, আধুনিক কালের প্রথম প্রাচ্যবিদ ছিলেন মুসলিম দেশসমূহে কার্যরত খৃষ্টান মিশনারীরা এবং ইসলামের শিক্ষা ও ইতিহাস থেকে তাঁরা যে বিকৃত চিত্র অংকন করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিলো ইউরোপীয়দের 'বিধর্মী'দের প্রতি মনোভাবের দিক দিয়ে প্রভাবিত করা; কিন্তু যদিও প্রাচ্যবাদী বিজ্ঞানসমূহ দীর্ঘকাল মিশনারী প্রভাবের কবলমুক্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে অজুহাত হিসাবে বিভ্রান্ত ধর্মীয় উদ্দীপনা আর নেই, তথাপি তাদের মনের সে বক্রতা এখনো বিরাজ করছে। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষ সোজাসুজি সহজাত বৃত্তি-প্রাথমিক ইউরোপের মনের ওপর ক্রুসেডের ও তার পরিণাম সংক্রান্ত ধারণার ভিত্তিযুক্ত মানসিক বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন উঠতে পারেঃ মূলের দিক দিয়ে মৌলিক এবং খৃষ্টীয় গীর্জার আত্মিক আধিপত্যের দরুন তখনকার দিনে সঞ্জাত প্রাচীন ঘৃণা কি করে এখনো ইউরোপে টিকে আছে, যখন ধর্মীয় মনোভাব সেখানে অতীতের ইতিকাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে?

কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকের কাছে এ জটিলতা মোটেই বিস্ময়কর নয়। তিনি বেশ ভালোভাবেই জানেন যে, ব্যক্তি বিশেষ তার শৈশবে অর্জিত ধর্মীয় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে, অথচ মূলের দিক দিয়ে তার সেই বাতিল বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিচিত্র কুসংস্কার তখনো

www.pathagar.com

বেঁচে থেকে তার সারা জীবনের যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে বানচাল করে দিতে পারে। ইসলামের প্রতি ইউরোপীয় মনোভাবের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। যদিও ইসলাম-বিরোধী বিদ্বেষের মূলীভূত ধর্মীয় মনোভাবের স্থান অধিকার করেছে জীবন সম্পর্কে অধিকতর জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি, তথাপি সেই প্রাচীন বিদ্বেষ ইউরোপীয় মনের এক অবচেতন দিক হয়ে রয়েছে। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে অবশ্যি তার বলিষ্ঠতার পার্থক্য রয়েছে. কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো মত বিরোধ নেই। ক্রুসেডের প্রাণবস্তু অবশ্যিই অত্যন্ত তরলায়িতরূপে ইউরোপের ওপর এখনো ছড়িয়ে রয়েছে এবং মুসলিম জাহানের ওপর তার সভ্যতার মনোভাব সেই নির্মম দানবের সুস্পষ্ট প্রভাবের চিহ্ন বহন করছে।

মুসলিম মহলে আমরা কখনো কখনো এমনি একটা বিশ্বাসের কথা শুনতে পাই যে, ইউরোপে অতীতের সুতীব্র সংঘাতের ফলোদ্ভুদ ইসলাম-বিদ্বেষ আজকের দিনে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এমন কি, একথাও বলা হচ্ছে যে, ইউরোপে ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা হিসাবে ইসলামের প্রতি প্রবণতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং বহু মুসলিম আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, ইউরোপীয়দের ইসলামে পাইকারী দীক্ষার দিন আসন্ন। আমরা যারা বিশ্বাস করি যে, সকল ধর্মীয় পদ্ধতির মধ্যে একমাত্র ইসলামই নিরপেক্ষ সমালোচনার মুখে টিকে থাকতে পারে, তাদের কাছে এ বিশ্বাস অযৌক্তিক নয়। অধিকন্তু রাসূলে করীম (সঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, পরিণামে ইসলাম সকল মানব জাতির কাছে গৃহীত হবে। কিন্তু পক্ষান্তরে সুন্দর কল্পনীয় ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা ঘটবার কোনো ক্ষীণতম আভাসও দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমী সভ্যতার কথা বলতে গেলে, সম্ভবতঃ এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে এমন কতকগুলো সামাজিক ও মানসিক বিপর্যয়ের পর, যা ইউরোপের সাংস্কৃতিক অহমিকা বিচূর্ণ করে তার মানসিকতায় এমন একটা পরিবর্তন আনবে, যাতে তার মন জীবনের ধর্মীয় ব্যাখ্যা মেনে নেবার মতো প্রস্তুতির পথে অগ্রসর হবে। পাশ্চাত্য দুনিয়া আজো তার বস্তুবাদী

www.pathagar.com

লাভের পূজায় আত্মসমাহিত এবং তার বিশ্বাস স্বাচ্ছন্দ্য এবং কেবল স্বাচ্ছন্দ্যই সকল কাজের একমাত্র লক্ষ্য। তার জড়বাদ, চিন্তাধারার ধর্মীয় সংগঠনে তার অস্বীকৃতি ক্রমাগত বলিষ্ঠ হচ্ছে এবং কোনো কোনো আশাবাদী মুসলিম পর্যবেক্ষক আমাদেরকে যেমন বিশ্বাস করতে বলছেন, তেমন করে তা' হ্রাস পাচ্ছে না।

বলা হচ্ছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতির দৃশ্যমান কাঠামোর পশ্চাতে একইরূপ সৃষ্টি ধর্মী শক্তির (creative power) অস্তিত্ব স্বীকার করতে শুরু করছে; এবং উপরোক্ত আশাবাদীরা বলেন যে, এটা হচ্ছে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় নতুন ধর্মীয় চেতনার পূর্বাশা। কিন্তু তাঁদের এ অনুমান কেবল ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁদের ভুল ধারণাই প্রকাশ করে। বিশ্বজগতের মূলে কোনো একক চলিষ্ণু কারণের (single dynamic cause) অস্তিত্বের সম্ভাবনা কোনো চিন্তাশীল বিজ্ঞানী অস্বীকার করতে পারেন না বা কখনো পারেননি। সেই কারণের ওপর কোন্ কোন্ 'গুণ' আরোপ করা যায়, তাই হচ্ছে প্রশ্ন এবং সব সময়েই এ প্রশ্নের অস্তিত্ব ছিলো। সর্বপ্রকার লোকোত্তর ধর্মীয় ধারায় স্বীকৃত হয়েছে যে, এই শক্তি হচ্ছে পূর্ণ চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী, এই শক্তিই নিজে কোনো আইনের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ না হয়ে কোনো বিশেষ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য অনুসারে বিশ্বজগত সৃষ্টি ও চালনা করছেন। এক কথায়, এই শক্তিই হচ্ছেন আল্লাহ্। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এতটা অগ্রসর হতে প্রস্তুত অথবা ইচ্ছুক নয় (প্রকৃত পক্ষে এটা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র নয়) এবং সে সেই সৃষ্টিধর্মী শক্তির চেতনা ও স্বাধীনতার–অপর কথায় তার ঐশীগুণের প্রশ্ন পূর্ণ অমীমাংসিত রেখেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মনোভাব হচ্ছে কতকটা এইরূপঃ 'হতে পারে, কিন্তু আমার জানা নেই, এবং তা জানবার কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থাও নেই।' ভবিষ্যতে এই দর্শন এমন এক সর্বেশ্বরবাদী অজ্ঞেয়বাদ–এর (pantheistic agnosticism) রূপ নিতে পারে, যার ধারণায় আত্মা ও জড়বস্তু, উদ্দেশ্য ও অস্তিত্ব, স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক এবং অভিন্ন। এই ধরনের বিশ্বাসকে আল্লাহ্ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট

www.pathagar.com

ইসলামী ধারণার পথে পদক্ষেপ বলে স্বীকার করে নেয়া কষ্টকর; কারণ, এ জড়বাদী পন্থা থেকে বিদায় গ্রহণ নয়, বরং সোজা কথায়, এক উচ্চতর, অধিকতর রুচিসংগত বুদ্ধিবৃত্তির পর্যায়ে তার উন্নয়ন।

প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ ইসলাম থেকে আজকের মতো এত দূরে আর কখনো ছিলো না। আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে তার সক্রিয় দুশমনী হয়তো হ্রাস পাচ্ছে; এর কারণ অবশ্যি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে উপলব্ধি নয়, বরং ইসলামী জাহানের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা ও ভাঙ্গনই এর কারণ। একদা ইউরোপ ইসলাম সম্পর্কে ভীত ছিলো এবং এই ভয় যে কোনো ইসলামী বর্ণবিশিষ্ট জিনিসের প্রতি এমন কি, নিছক আত্মিক ও সামাজিক ব্যাপারের প্রতিও তাকে দুশমনী মনোভাব সম্পন্ন করে তুলেছিলো। কিন্তু ইসলাম যখন ইউরোপীয় রাজনৈতিক স্বার্থের বিরোধী হিসাবে তার বেশীর ভাগ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে, তখন এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ভীতি হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে ইউরোপের ইসলাম বিরোধী মনোভাবের মৌলিক তীব্রতাও কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। যদি তা' অপেক্ষাকৃত কম বিঘোষিত ও সক্রিয় হয়, তাতে আমরা এমন সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে, পাশ্চাত্য ভিতরের দিক দিয়ে ইসলামের নিকটতর হয়েছে; বরং এতে কেবল ইসলামের প্রতি তার ক্রমবর্ধমান ঔদাসীন্যই প্রকাশ পাচ্ছে।

পশ্চিমী সভ্যতা কোনো দিক দিয়েই তার বিচিত্র মনোভাব পরিবর্তন করেনি। এখনো সে বরাবরেরই মতো জীবনের ধর্মীয় ধারণার বিরোধী এবং আমি পূর্বেই বলেছি, অদূর ভবিষ্যতে এর কোনো পরিবর্তন ঘটনার সম্ভাবনার নির্ভরযোগ্য লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পাশ্চাত্যে ইসলামী মিশনের অস্তিত্ব এবং কোনো কোনো ইউরোপীয় ও আমেরিকাবাসীর ইসলামে দীক্ষা (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ণ উপলব্ধি ব্যতীত) এ সম্পর্কে যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানো যেতে পারে না। যে যুগে জড়বাদ সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী, তখন এটা স্বাভাবিক যে, এখানে-সেখানে ব্যক্তিগতভাবে আত্মিক পূনর্জাগরণের

www.pathagar.com

আকাংখা পোষণকারী কতক লোক লুব্ধভাবে ধর্মীয় ধারণার ভিত্তিযুক্ত যে কোনো মতবাদ শ্রবণ করে। এদিক দিয়ে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে কেবল মুসলিম মিশনেরই অস্তিত্ব নেই, 'পুনরুজ্জীবনের' মনোভাবযুক্ত অসংখ্য খৃষ্টান ভাববাদী সম্প্রদায় রয়েছে, বেশ বলিষ্ঠ আধ্যাত্মবাদী আন্দোলন (Theosophic movement) রয়েছে; তাছাড়া রয়েছে ইউরোপীয় শহরগুলিতে বৌদ্ধ মন্দির মিশন ও নবদীক্ষিত মানুষেরা। মুসলিম মিশনের মতো একই ধরনের যুক্তি দেখিয়ে সেসব বৌদ্ধ মিশনও দাবী করতে পারে (এবং দাবী করে) যে, ইউরোপ বৌদ্ধ ধর্মের কাছাকাছি আসছে। উভয় ক্ষেত্রেই এই ধরনের উক্তি হাস্যকর। কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের বৌদ্ধ ধর্মে আপনা ইসলামে দীক্ষা গ্রহণে এটা মোটেই প্রমাণিত হয় না যে, এই দুটি মতবাদের কোনোটি প্রকৃতপক্ষে কোনোরূপ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পাশ্চাত্য জীবনকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। কোনো 'বিদেশাগত' মতবাদ রোমান্টিক প্রবণতা সম্পন্ন মানুষের মনের ওপর যে মুগ্ধকর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, প্রধানতঃ তারই দরুন এই মিশনগুলির কোনোটিই অত্যন্ত অল্প পরিমাণ কৌতূহলের বেশী জাগাতে পারেনি, এ কথা হয়তো আরো এগিয়ে কেউ কেউ বলতে পারেন। এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে এবং কোনো কোনো নবদীক্ষিত ব্যক্তি সত্যিকারভাবে সত্যানুসন্ধিৎসু হতে পারেন; কিন্তু ব্যতিক্রম কোনো একটি সভ্যতার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন আনতে পারে না। পক্ষান্তরে, প্রতি দিন যে সংখ্যক প্রাচ্যের বাসিন্দা মার্কসবাদ বা ফ্যাসিবাদের মতো নিছক জড়বাদী সামাজিক মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করছে, তার সাথে এসব ব্যতিক্রমমূলক দীক্ষার তুলনা করে দেখলে আমরা নির্ভুলভাবে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার ধারা উপলব্ধি করতে পারবো।

ইতিপূর্বে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি এরূপ হতে পারে যে, ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অশান্তি এবং সম্ভবতঃ অজ্ঞাতপূর্ব ব্যাপ্তি ও বৈজ্ঞানিক ভীতিবিশিষ্ট নতুন নতুন বিশ্বযুদ্ধ পশ্চিমী সভ্যতার

www.pathagar.com

জড়বাদী অহমিকাকে এমন এক ভয়াবহ অসম্ভাব্য পর্যায়ে চালিত করবে যে, পাশ্চাত্যের জনগন আরেকবার বিনয় ও আন্তরিকতা সহকারে আত্মিক সত্যের সন্ধান করতে শুরু করবে; এবং তখনই সাফল্যের সহিত পাশ্চাত্যে ইসলাম প্রচার সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এমন কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা এখনো ভবিষ্যতের দিগন্তের অন্তরালে লুক্কায়িত। সুতরাং ইসলামী প্রভাব ইউরোপীয় ভাবধারার ওপর বিজয় লাভ করতে চলেছে বলা মুসলমানদের পক্ষে এক বিপজ্জনক আত্ম-প্রতারণামূলক আশাবাদ। প্রকৃতপক্ষে, এই আলোচনা 'যুক্তিবাদের' ছদ্মবেশে প্রাচীন মাহ্‌দী বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়-অর্থাৎ এমন একটা শক্তির ওপর বিশ্বাস, যা' হঠাৎ আবির্ভূত হ'য়ে ইসলামের পতনোন্মুখ কাঠামোকে বিশ্ব বিজয়ী করে দিবে। এ বিশ্বাস বিপজ্জনক, কারণ তা' মনোমুগ্ধকর ও সহজ এবং তা' আমাদেরকে এই সত্য উপলব্ধি থেকে দূরে নিয়ে যায় যে, আজকের দিনে পাশ্চাত্য প্রভাব যখন মুসলিম জাহানের ওপর সর্বাধিক ক্ষমতা বিস্তার করছে, তখন সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আমাদের অস্তিত্বই নেই; যখন সে-সব প্রভাব সর্বত্র ইসলামী সমাজকে বিপন্ন ও ধ্বংস করছে, তখন আমরা নিদ্রাভিভূত হ'য়ে আছি। ইসলামের প্রসার কামনা এক জিনিষ এবং এ আকাংখার ওপর মিথ্যা আশার প্রাসাদ গড়া অন্য জিনিষ।

সুদূরবর্তী দেশসমূহের ওপর ইসলামের আলোক প্রসার লাভ করবে, এ স্বপ্ন আমরা দেখছি; অথচ আমাদেরই ঠিক চারপাশের মুসলিম তরুণরা আমাদের লক্ষ্য ও আশার পথ বর্জন ক'রে দূরে চলে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রসংগে

পাশ্চাত্য সভ্যতাই মুসলমানদের স্থবির সভ্যতাকে নব জীবন দান করার মতো একমাত্র শক্তি মনে ক'রে মুসলিমরা যতোদিন সেদিকে তাকিয়ে থাকবে, ততোদিন তারা তাদের আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করবে এবং পরোক্ষভাবে এই পাশ্চাত্য মতবাদকে সমর্থন ক'রে যাবে যে, ইসলাম হচ্ছে একটি 'ক্ষয়িত শক্তি' (Spent force)।

পূর্ববর্তী আলোচনায় এই অভিমতের স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা ক'রে দেখানো হয়েছে যে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে বিপরীতধর্মী জীবন-দর্শনের ভিত্তিযুক্ত বলেই প্রাণবস্তুর দিক দিয়ে সুসমঞ্জস নয়। সুতরাং কি ক'রে আমরা আশা করবো যে, পাশ্চাত্য ধারায় মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের শিক্ষা-সম্পূর্ণ ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের ওপর ভিত্তিযুক্ত শিক্ষা ইসলাম বিরোধী প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে?

এরূপ প্রত্যাশা করা আমাদের পক্ষে সংগত হবে না। যে-সব বিশেষ ক্ষেত্রে শক্তিশালী মন শিক্ষাগত ব্যাপারের ওপর বিজয়ী হতে পারে, সেসব ক্ষেত্রে ব্যতীত মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ফলে রাসূলে করীম (সঃ)-এর শিক্ষার প্রতি তাদের ঈমান অক্ষুন্ন রাখার ইচ্ছা, বিচিত্র ইসলামী ধর্মীয় সভ্যতার প্রতিনিধি হিসাবে তাদের নিজেদেরকে পরিচিত করার ইচ্ছা ব্যাহত হতে বাধ্য। পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত 'সুধীসমাজের' ওপর ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। এতে অবশ্যি একথা বুঝায় যে, বাস্তব ধর্ম হিসাবে ইসলাম তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে কেবল অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে; কিন্তু যে কারণেই হোক, ইসলামের আহ্বান পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন 'সুধীসমাজ' অপেক্ষা তাদেরই

www.pathagar.com

মধ্যে সত্য-উপলব্ধির আদিম পদ্ধতির মাধ্যমে বহুগুণে অধিক সাড়া জাগাচ্ছে; তা' আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইসলামের প্রতি সুধীসমাজের এই বিরোধী মনোভাব বিশ্লেষণ করলে এ-কথা বলা চলে না যে, যে-পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাদের মনকে প্রভাবিত করেছে, তা' আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার সত্যের বিরুদ্ধে তাদের সামনে কোনো সংগত যুক্তি পেশ করেছে; বরং আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিগত আবহাওয়াই এমন তীব্র ধর্মবিরোধী যে তা' আমাদের মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সম্ভাবনার ওপর এক ভারী বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও অবিশ্বাস খুব কম ক্ষেত্রেই নিছক যুক্তির ব্যাপার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের মূলে থাকে সহজাত বৃত্তি, অথবা আমরা বলতে পারি অন্তর্দৃষ্টি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের কাছে তা' পৌঁছে সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতার মাধ্যমে। এমন একটি শিশুর কথা মনে করা যেতে পারে, যে জীবনের শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে উচ্চাংগ সংগীতের ধ্বনির সংগে পরিচিত। তার কর্ণ ধ্বনি, ছন্দ ও সুর বুঝতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে এবং পরবর্তী জীবনে সে জটিলতম সংগীত রচনা করতে না পারলেও তা' উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। কিন্তু যে বালক তার প্রথম জীবনে কখনো সংগীত জাতীয় কোনো কিছু শ্রবণ করেনি, পরবর্তী জীবনে তার পক্ষে সংগীতের উপাদান উপলব্ধি করাও কঠিন। ধর্মীয় সংযোগের ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা। যেমন, সম্ভবতঃ এক শ্রেণীর লোক আছে, প্রকৃতি যাদেরকে 'সংগীত' উপলব্ধির কর্ণ থেকে বঞ্চিত করেছে। তেমনি অসম্ভাব্য হলেও হয়তো এমন সব ব্যক্তি রয়েছে, যারা ধর্মের আহ্বানের কাছে সম্পূর্ণ বধির। কিন্তু অধিকাংশ স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের বিকল্প মনোভাব তারা যে আবহাওয়ায় পালিত, তা' অনুযায়ীই গড়ে ওঠে। এ কারণেই রাসূলে করিম (সঃ) বলেছেনঃ

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ ـ

www.pathagar.com

"প্রত্যেক শিশুই জন্মলাভ করে মৌলিক 'পবিত্রতায়; তার বাপ-মা'ই তাকে পরিণত করে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা মূর্তিপূজকে। (সহীহ্ আল-বুখারী)

উপর্যুক্ত হাদীসে ব্যবহৃত 'বাপ-মা' ন্যায়শাস্ত্রমতে সম্প্রসারিত হ'য়ে পারিবারিক জীবন, বিদ্যালয়, সমাজ প্রভৃতি সাধারণ পারিপার্শ্বিকতা বুঝাতে পারে, যার ভিতরে শিশুর প্রাথমিক বিকাশ সম্ভব হয়। এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে, বর্তমান পতনমূখী অবস্থায় বহু মুসলিম পরিবারেই ধর্মীয় আবহাওয়া এমন নিম্ন স্তরের ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে অধঃপতিত ধরনের যে, বর্ধিষ্ণু তরুণ-মনে তা' প্রথম উৎসাহ যোগায় ধর্মবিমুখ হবার। এরূপ সম্ভাবনা অনেকখানি নিশ্চিত; কিন্তু পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা প্রাপ্ত হোলে এ সব তরুণ মুসলিমের পরবর্তী জীবনে ধর্মবিমুখতার মনোভাব সৃষ্টি হবার কেবল যে সম্ভাবনা রয়েছে তাই নয়, বরং সেটাই হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু এখানে একটি বড়ো প্রশ্নের অবতারণা করতে হয়ঃ আধুনিক শিক্ষার প্রতি আমাদের মনোভাব কি হওয়া উচিত?

মুসলিমদের পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অর্থ মোটেই এ নয় যে, ইসলাম শিক্ষার বিরোধী। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের এই অভিযোগের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই। যেনো তোমরা জ্ঞানী হতে পার', 'যেনো তোমরা চিন্তা কর' 'যেনো তোমরা উপলব্ধি করতে পার'-এই ধরনের উক্তি পবিত্র কুরআনের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। কালামে পাকের শুরুতে বলা হয়েছেঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ـ

"এবং তিনি (আল্লাহ্) আদমকে যাবতীয় নামসমূহ শিক্ষা দিলেন।" (সূরা ২ঃ৩১)।

এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে দেখা যায় যে, উক্ত 'নামসমূহের জ্ঞানের দরুনই মানুষ একটি বিশেষ দিক দিয়ে ফেরেশতারও উর্ধে।

www.pathagar.com

নামসমূহ হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ শক্তির, সুসংবদ্ধ চিন্তাশক্তির রূপক প্রকাশ–যা' মানব–চরিত্রে বিচিত্র রূপে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং কুরআনের কথায় তাকে দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দাবীদার করেছে। চিন্তাধারাকে ধারাবাহিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য মানুষকে অবশ্যি শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, এবং এই কারণেই হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেনঃ

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ– ـ

"যদি কেউ জ্ঞানের সন্ধানে পথ অতিক্রম করে, তার জন্য আল্লাহ সহজ করে দিবেন জান্নাতের পথ।" (সহিহ্ মুসলিম)

اِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ– ـ

"(নিছক) উপাসনাকারীর ওপর বিদ্বানের শ্রেষ্ঠত্ব সকল তারকা মন্ডলীর ওপর পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মতো।"[১]

কিন্তু বিদ্যার্জনের প্রতি ইসলামের মনোভাবের সমর্থনে কুরআন ও হাদীস থেকে উদ্ধৃতির প্রয়োজনও হয় না। ইতিহাস সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে যে, ইসলাম যেমন বিজ্ঞানে অগ্রগতির প্রেরণা দিয়েছে, অপর কোনো ধর্মই কখনো তা' দেয়নি। শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইসলামী ধর্মশাস্ত্র থেকে যে উৎসাহ পেয়েছে, তার ফলে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে এবং স্পেনে আরব শাসনের যুগে গৌরবদীপ্ত সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয়েছিলো। এ তথ্য ইউরোপের ভালোভাবেই জানা উচিত; কারণ বহু অন্ধকার শতাব্দীর পর প্রাপ্ত রেনেসাঁর (পুনর্জন্ম) চাইতে ইসলামের কাছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি কম

(১) মসনদে ইবনে হাম্বল, জামিয়াত তিরমিযী, সূনান আবু দাউদ, সুনান ইবনে মাযা, সুনান আদ–দারিমী

www.pathagar.com

ঋণী নয়। ইসলামী জাহান যখন তার নিজস্ব ঐতিহ্য ত্যাগ করে পুনরায় অন্ধত্ব ও বুদ্ধির দৈন্যে নিমজ্জিত হয়েছে, তখন ইসলামের গৌরবময় স্মৃতি নিয়ে গর্ব প্রকাশ করবার জন্যই আমি তার উল্লেখ করছি না বর্তমান দুর্দিনে অতীতের গৌরবগাথা আবৃতি করে গর্ব করবার কোনো অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যি উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের বর্তমান পতনের জন্য দায়ী কেবল মুসলিমদের অবহেলা, ইসলামী শিক্ষার কোনো ত্রুটি নয়।

ইসলাম কখনো প্রগতি ও বিজ্ঞানের পথে অন্তরায় ছিলো না। ইসলাম মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত কার্যকলাপকে এতটা . উপলব্ধি করেছে যে, তাকে স্থান দিয়েছে ফেরেশতারও উর্ধে। জীবনের অন্যবিধ সর্বপ্রকার বিকাশের উর্ধে যুক্তি ও শিক্ষার প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দিবার পথে কোনো ধর্মই এতটা অগ্রসর হয়নি। ধর্মের এই নীতির সাথে আমাদের নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করলে আমাদের জীবন থেকে আধুনিক শিক্ষাকে বাদ দিবার কথা আমরা ভাবতেও পারি না। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সাথে সমতালে আমাদেরকেও শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, অগ্রগতির আকাংখা পোষণ করতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে, পশ্চিমের দৃষ্টি দিয়ে কোনো মুসলিম কিছু দেখতে চাইবে না, পশ্চিমী ধারায় চিন্তা করবে না; মুসলিম হয়ে থাকতে চাইলে তারা পশ্চিমের জড়বাদী পরীক্ষার সাথে ইসলামের আত্মিক সভ্যতার বিনিময় করতে চাইবে না।

জ্ঞান প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনোটাই নয়-সে হচ্ছে সার্বজনীন, যেমন সার্বজনীন প্রাকৃতিক তথ্য। কিন্তু যে দৃষ্টিভংগিতে সে তথ্য বিবেচনা ও পেশ করা যায়, জাতিসমূহের সাংস্কৃতিক প্রবণতা অনুসারে হয় তার ব্যতিক্রম। প্রাণীবিদ্যা, শরীরবিদ্যা অথবা উদ্ভিদবিদ্যার কোনোটিই সম্ভাবনা ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে জড়বাদী অথবা অধ্যাত্মবাদী নয়; তথ্যসমূহের পর্যবেক্ষণ, সংগ্রহ ও সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং

www.pathagar.com

তা' থেকে সাধারণ বিধি নির্ধারণ হচ্ছে তাদের কাজ। কিন্তু এই সব বিজ্ঞান থেকে লব্ধ অনুমানভিত্তিক দার্শনিক সিদ্ধান্ত অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দর্শন কেবল তথ্য ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিযুক্ত নয়; বরং তার ওপর রয়েছে খুব বেশী করে জীবন ও তার সমস্যাসমূহের প্রতি আমাদের পূর্ব-প্রবণতা বা সহজাত মনোভাবের প্রভাব। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্ট (Kant) মন্তব্য করেনঃ "প্রথমে এটা বিস্ময়কর মনে হয়; কিন্তু এতে মোটেই অনিশ্চয়তা নেই যে আমাদের যুক্তি প্রকৃতি থেকে তার সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করে না, বরং তার ওপর চাপিয়ে দেয়।" সোজা কথায়, কল্পিত দৃষ্টিভংগিই এখানে কাজ করে যায়; কারণ এতে লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। এইভাবে যে বিজ্ঞানী নিজে জড়বাদী বা অধ্যাত্মবাদী কোনোটাই নয়, তা' আমাদেরকে চালিত করতে পারে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ব্যাখ্যার দিকে; সে ব্যাখ্যা আমাদের পূর্ব ধারণা অনুযায়ী অধ্যাত্মবাদী বা জড়বাদী হতে পারে। অত্যন্ত সুরুচিসংগত বুদ্ধিবৃত্তি সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দেশ জড়বাদী পূর্বধারণা সম্পন্ন এবং ধারণা ও মৌলিক অনুমানের দিক দিয়ে ধর্মবিরোধী, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতিও সামগ্রিকভাবে অনুরূপ হতে বাধ্য। অন্য কথায়, কেবল আধুনিক ভূয়োদর্শনসঞ্জাত বিজ্ঞান অধ্যয়নই নয়, বরং পশ্চিমী সভ্যতার যে ভাবধারার মাধ্যমে আমরা এই সকল বিজ্ঞান পাঠে প্রবৃত্ত হই, তা' হচ্ছে ইসলামের সাংস্কৃতিক বাস্তবতার বিরোধী।

এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে আমাদের ঔদাসীন্য ও অবহেলা আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের পাশ্চাত্য উৎস সমূহের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। ইসলামের যে নীতি প্রত্যেক মুসলিমের ওপর বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনের কর্তব্য চাপিয়ে দিয়েছে, তা' সর্বদা পালন করলে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য আমাদেরকে পাশ্চাত্যের দিকে তাকাতে হতো না, ঠিক যেমন করে মরুভূমিতে মরণ পথযাত্রী পিপাসাতুর ব্যক্তি দিগন্তের মরীচিকার দিকে তাকিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

কিন্তু মুসলিমরা দীর্ঘকাল তাদের নিজস্ব সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করেই অজ্ঞতা ও দৈন্যে নিমজ্জিত হয়েছে এবং ইউরোপ শক্তিশালী পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে বহুদূর। তাদের মধ্যে এ পার্থক্য দূর করতে বহু সময় লাগবে। ততদিন স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে আধুনিক বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে হবে পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু এর একমাত্র অর্থ হয় এই যে, আমরা কেবল বৈজ্ঞানিক বিষয় ও পদ্ধতিই গ্রহণ করতে বাধ্য হবো, আর কিছুই নয়। অন্য কথায়, পাশ্চাত্য ধারায় সঠিক বিজ্ঞান (exact science) অধ্যয়ন করতে আমাদের দ্বিধা করা উচিত নয়, কিন্তু মুসলিম তরুণের শিক্ষায় আমরা তাদের দর্শনের কোনো অংশ স্বীকার করে নেবো না। অবশ্যি কেউ বলতে পারেন যে, বর্তমান সঠিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে অনেক গুলোই–দৃষ্টান্ত স্বরূপ আণবিক পদার্থবিদ্যা নিছক ভূয়োদর্শন সংক্রান্ত অনুসন্ধানের সীমা অতিক্রম করে দার্শনিক ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়েছে; এবং বহু ক্ষেত্রে ভূয়োদর্শনসঞ্জাত বিজ্ঞান ও কল্পনাভিত্তিক দর্শনের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখাটানা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। একথা সত্য। কিন্তু অপর দিকে ঠিক এই ক্ষেত্রেই ইসলামী সংস্কৃতিকে তার নিজস্ব সত্তা প্রমাণ করতে হবে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা যখন একবার বৈজ্ঞানিক গবেষণার এই সীমান্তরেখায় উপনীত হবেন, তখনই পাশ্চাত্য দার্শনিক সূত্রের পরিবর্তে স্বাধীনভাবে নিজস্ব কল্পনাভিত্তিক যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তব্য ও সুযোগ তাঁদের সামনে আসবে। তাঁদের নিজস্ব ইসলামী মনোভাব থেকে তাঁরা সম্ভবতঃ এমন সব সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন, যা' আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই সিদ্ধান্ত থেকে হবে আলাদা ধরনের।

কিন্তু ভবিষ্যতে যাই হোক, আজকের দিনেও পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিগত মনোভাবের কাছে দাসসুলভ আত্মসমর্পণ না করে বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও শিক্ষাদান নিশ্চিতরূপে সম্ভব। ইসলামী দুনিয়ার সব চাইতে যরুরী প্রয়োজন যে জিনিসটির, তা' নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভংগি নয়, বরং তা' হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কার্যকরী উপকরণ।

www.pathagar.com

ইসলামী বিবেচনা দ্বারা চালিত কোনো আদর্শ শিক্ষাবোর্ডের কাছে প্রস্তাব পেশ করতে গেলে আমি দাবী করতাম যে, পাশ্চাত্যের সর্বপ্রকার জ্ঞান-সম্পদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রকৃতি-বিজ্ঞান (উল্লিখিত নিয়ন্ত্রিত মনোভাবসহ) ও গণিতশাস্ত্র মুসলিম বিদ্যালয়সমূহে অধীত হওয়া উচিত এবং বর্তমানে শিক্ষনীয় বিষয়াবলীর মধ্যে ইউরোপীয় দর্শন সাহিত্য ও ইতিহাস যে মর্যাদা লাভ করেছে, তা' হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। ইউরোপীয় দর্শনের প্রতি আমাদের মনোভাব কি হওয়া উচিত, ওপরের আলোচনায় তা' স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের কথা বলতে গেলে তাকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না; কিন্তু তাকে শুধু ভাষাশিক্ষা সংক্রান্ত মর্যাদাই দিতে হবে। বর্তমানে মুসলিম দেশসমূহে যে ভাবে তা' শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তা' স্পষ্টতঃ পক্ষপাতমূলক। পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতিবাচক দিক যথেষ্ট পরিমাণে উপলব্ধি করবার আগেই তার সীমাহীনভাবে অতিরঞ্জিত মূল্যবোধ অপরিপক্ক যুব-মনকে সর্বান্তঃকরণে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাবধারা গ্রহণে প্ররোচিত করে। সুতরাং কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেটোবাদী উপাসনা নয়, বাস্তব অনুকরণের ক্ষেত্রও তৈরী হয়ে যায়, যা ইসলামী ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে না। শিক্ষার্থীদের ইসলামী তমদ্দুনের গভীরতা ও সম্পদ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ক'রে তাদের মধ্যে ভবিষ্যতের নতুন আশা-উদ্দীপনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে মুসলিম বিদ্যালয়সমূহে ইসলামী সাহিত্যের যুক্তিসংগত বাদবিচারপূর্ণ শিক্ষা দ্বারা ইউরোপীয় সাহিত্যের বর্তমান স্থান পূরণ করা প্রয়োজন।

বর্তমানে বহুসংখ্যক মুসলিম বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় সাহিত্য যে রূপে প্রচলিত রয়েছে তা' যদি তরুণ মুসলিম-মনকে ইসলামের বিরোধী করে তোলার সহায়তা করে তা' হলে বিশ্ব ইতিহাসের ইউরোপীয় ভাষ্যের বেলায় সে কথা আরো বহুগুনে বেশী সত্যি। তার ভিতরে রোমান বনাম বর্বর এর পুরাতন মনোভাব অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়। স্বীকার না করলেও তাদের ইতিহাস বর্ণনার উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

হচ্ছে এই তথ্য প্রমাণ করা যে, দুনিয়ায় যত রকম সভ্যতা এসেছে ও আসতে পারে, তার মধ্যে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ও তাদের সভ্যতাই শ্রেষ্ট; সুতরাং তাতে দুনিয়ার বাকী অংশের ওপর পাশ্চাত্যের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসের স্বপক্ষে নৈতিক যৌক্তিকতার মতো একটা কিছু খাড়া করা হয়। রোমানদের আমল থেকে ইউরোপীয় জাতিসমূহ প্রাচ্যও পাশ্চাত্যের সর্বপ্রকার পার্থক্যকে কাল্পনিক ইউরোপীয় আদর্শের দৃষ্টিভংগি দিয়ে বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের যুক্তি এই কল্পনার ওপরই কাজ করে যায় যে, মানবতার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিচার করা যায় কেবলমাত্র ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এই ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি স্বাভাবিকভাবে একটি বিকৃত চিত্রের অবতারণা করে এবং তাদের পর্যবেক্ষণের সীমানা অভ্যস্ত দৃষ্টিভংগির ভিত্তি থেকে যতো দূরবর্তী হয়, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের পক্ষে তার বিবেচ্য ঐতিহাসিক লক্ষ্যবস্তুর স্বরূপ ও কাঠামো উপলব্দি ততো বেশী কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

ইউরোপীয়দের এই আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের দরুন তাদের রচিত বর্ণনাত্মক বিশ্ব ইতিহাস সাম্প্রতিক-কাল পর্যন্ত পাশ্চাত্যের পরিবর্ধিত ইতিহাসের বেশী কিছুই হয়নি। অ-ইউরোপীয় জাতিসমূহকে কেবল তখনই হিসাবে ধরা হয়েছে, যখন তাদের অস্তিত্বও বিকাশ ইউরোপের ভাগ্যের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। যদি ইউরোপীয় জাতিসমূহের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে সালংকারে বর্ণনা করা যায় এবং বাকী দুনিয়া সম্পর্কে এখানে সেখানে ছিটে ফোটা বর্ণনা দেয়া যায়, তা হলে পাঠককে বাধ্য হয়ে এই ধারণাই মেনে নিতে হবে যে, ইউরোপের মহৎ কৃতিত্ব সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত দিক দিয়ে বাকী দুনিয়াকে ছাড়িয়ে গেছে সকল অনুপাতের বাইরে। এমনি করে অনেকটা এই ধারণারই সৃষ্টি হবে, যেনো ইউরোপ ও তার সভ্যতার জন্যই দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছিলো এবং অন্যান্য সকল সভ্যতার কার্য হচ্ছে কেবল পাশ্চাত্য মহিমার যোগ্য অবস্থানস্থল গড়ে তোলা। এই ধরণের ইতিহাস শিক্ষায়

www.pathagar.com

অ-ইউরোপীয় তরুণ মনের ওপর একমাত্র ফল হতে পারে তাদের নিজস্ব তমদ্দুন, ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভবনা সম্পর্কে একটা হীনম্মন্যতার ধারণা সৃষ্টি। তাদেরকে ক্রমাগত শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের নিজস্ব ভবিষ্যতকে অবজ্ঞা করতে-যতোক্ষণ না সে ভবিষ্যৎ হয় পাশ্চাত্য আদর্শের কাছে আত্মসমর্পিত।

এই কুফল প্রতিরোধের জন্য ইসলামী চিন্তাধারার দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের কর্তব্য হচ্ছে মুসলিম বিদ্যালয়সমূহে ইতিহাস শিক্ষার ধারা সংশোধনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা। এ কর্তব্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন এবং মুসলিম দৃষ্টিভংগিতে নতুন করে বিশ্ব-ইতিহাস প্রণয়নের পূর্বে প্রয়োজন হবে আমাদের ইতিহাস শিক্ষার ধারায় ব্যাপক সংস্কার সাধন। কিন্তু কঠিন হলেও এ কর্তব্য পালন করা সম্ভব এবং সর্বোপরি অত্যন্ত যরুরী। অন্যথায় আমাদের তরুণ সমাজ ইসলাম বিদ্বেষের গোপন স্রোতধারায় ক্রমাগত প্রবাহিত হতে থাকবে এবং ফলে তাদের হীনম্মন্যতা আরো বেশী করে দৃঢ় বদ্ধমূল হবে। এই হীনমন্যতাকে জয় করা নিঃসন্দেহে সম্ভব হবে, যদি মুসলিমরা ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে ইসলামকে তাদের জীবন থেকে নির্বাসন দিতে রাজী হয়। কিন্তু তাতে কি তারা রাজী?

আমরা বিশ্বাস করি এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দ্বারা সে বিশ্বাস সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী নীতিশাস্ত্র, ইসলামের সামাজিক ও ব্যক্তিগত নীতিবোধ, বিচার ও স্বাধীনতার ধারণা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরূপ ধারণা ও আদর্শ থেকে বহুগণে পূর্ণতর। ইসলাম জাতি বিদ্বেষের মূলোচ্ছেদ করেছে এবং মানব-ভ্রাতৃত্বও সাম্যের পথ উন্মুক্ত করেছে, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনো বর্ণগত ও জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সীমানার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করতে অক্ষম। ইসলামী সমাজে কখনো শ্রেনীবিভাগও শ্রেনীবিরোধের অস্তিত্ব নেই; কিন্তু গ্রীস ও রোমের আমল থেকে শুরু করে আমাদের কাল পর্যন্ত ইউরোপের সমগ্র ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রাম, ও সামাজিক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ।

www.pathagar.com

বারংবার আমাদেরকে এই কথাই বলতে হয় যে, পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কোনো মুসলিম লাভজনকভাবে একটি জিনিষই মাত্র শিখতে পারে এবং তা' হচ্ছে অবিমিশ্র ও ফলিতরূপে সঠিক বিজ্ঞান (exact science in their pure and applied forms)। বাইরে থেকে বিজ্ঞানের সন্ধান করার প্রয়োজন যেনো। কোনো মুসলিমকে এ কথা ভাবতে প্ররোচিত না করে যে, পশ্চিমী সভ্যতা তার নিজস্ব সভ্যতা থেকে শ্রেষ্ঠ, তা হলে সে ইসলামের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারবে না। কোনো জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রসরতার ওপর নির্ভর করে না (যদিও তা বাঞ্ছনীয়।; বরং তা নির্ভর করে নৈতিক উদ্যমের ওপর– মানব–জীবনের সকল দিকের ব্যাখ্যা ও সমন্বয় সাধনের বৃহত্তর সম্ভবনার ওপর। এদিক দিয়ে ইসলাম অন্য সকল সংস্কৃতিকে ছাড়িয়ে গেছে। মানব–জীবনের সর্বোত্তম কৃতিত্ব অর্জনের জন্য আমাদেরকে কেবল ইসলামের বিধিসমূহ অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু যদি আমরা ইসলামী মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রাখতে ও পুনরুজ্জীবিত করতে চাই, তা' হলে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করতে পারি না ও করবো না। পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণ দ্বারা আমাদের যে বস্তুবাদী লাভের সম্ভবনা আছে, তার তুলনায় সে সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিগত প্রভাবের আনীত অকল্যাণ ইসলামী সমাজ–দেহে হবে অধিকতর ক্ষতিকর।

অতীতে মুসলিমরা যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করে থাকে, আজ অনিয়ন্ত্রিতভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে তারা সে ভুলের ক্ষতি পূরণ করতে পারে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার কাঠামো অন্ধভাবে অনুসরণের ফলে মুসলিম জাহানের ধর্মীয় সম্ভবনার ক্ষেত্রে যে মারাত্মক পরিণতি আসবে, তার সাথে আমাদের সর্ববিধ বৈজ্ঞানিক পশ্চাদগতি ও দৈন্যের তুলনা করা চলে না। যদি আমরা সাংস্কৃতিক উপাদান হিসাবে ইসলামের বাস্তবতা অক্ষুন্ন রাখতে চাই, তা হলে আমাদেরকে পশ্চিমী সভ্যতার যে সভ্যতা আজ আমাদের সমাজ ও আমাদের প্রবণতার ওপর বিজয় লাভ করতে এগিয়ে আসছে–

www.pathagar.com

বুদ্ধিবৃত্তিগত আবহাওয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। পাশ্চাত্যের আচার-ব্যবহার ও জীবন পদ্ধতি অনুকরণের ফলে মুসলিমরা ক্রমে পাশ্চাত্য দৃষ্টি ভংগি অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ বাইরের রূপের অনুকরণ অনুরূপভাবে ধীরে ধীরে মানুষকে চালিত করে সে রূপের মূলীভূত দৃষ্টিভংগিকে আত্মস্থ করার পথে।

www.pathagar.com

পরানুকরণ প্রসংগে

ইসলামী সভ্যতার অস্তিত্ব তথা পুনর্জাগরণের পক্ষে নিঃসন্দেহে সব চাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে পাশ্চাত্য জীবনধারার অনুকরণ। এই সাংস্কৃতিক সংকটের (সাংস্কৃতিক সংকট ছাড়া আর কিছু বলা যায় না একে) মূল সূচিত হয়েছিলো কয়েক দশক আগে এবং তা' হচ্ছে মুসলিম-মনের হতাশার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তারা চোখের সামনে দেখেছে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী শক্তি ও অগ্রগতি, আর তার সাথে তুলনা করেছে নিজ সমাজের দুঃখজনক অবস্থার। বিশেষ করে তথাকথিত ওলামা শ্রেণীর সংকীর্ণ মানসিকতার দরুন ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে মুসলমানদের অজ্ঞতার ভিতর থেকে আরেকটি ধারণা জন্ম নিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, মুসলিমরা পাশ্চাত্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি অবলম্বন না করলে বাকী দুনিয়ার অগ্রগতির সাথে সমতালে পা ফেলে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। মুসলিম জাহান ছিলো গতিহীন; এবং বহু মুসলিমই এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, ইসলামী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি অগ্রগতির প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে উপযোগী নয় এবং সেই কারণেই পাশ্চাত্য ধারায় তার সংশোধনের প্রয়োজন। শিক্ষা হিসাবে ইসলাম মুসলিমদের পতনের জন্য কতটা দায়ী, সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালানোর কষ্ট স্বীকার করে দেখলেন না এই সব 'আলোকপ্রাপ্ত' লোকেরা। তাঁরা ইসলামের অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত ভাবধারা সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর নেবার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। কেবল এটাই দেখালেন যে, তাঁদের সমসাময়িক ধর্মবাদীদের শিক্ষা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও বাস্তব কৃতিত্ব অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ইসলামেরমূল উৎসের দিকে মনোযোগ না দিয়ে তাঁরা নীরবে ইসলামী শরীয়তকে বর্তমান যুগে

www.pathagar.com

প্রস্তর-কঠিন ফিক্‌হশাস্ত্রের সাথে অভিন্ন করে দেখলেন এবং তার মধ্যে খুঁজে বের করলেন বহুবিধ অভাব; ফলে শরীয়তের প্রতি সর্বপ্রকার বাস্তব মনোযোগ হারিয়ে ফেলে তাকে তাঁরা ইতিহাস ও পুঁথিগত বিদ্যার পর্যায়ে ফেলে রাখলেন। পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণই তাঁদের কাছে মুসলিমদের পতনের পক্ষ থেকে নিষ্কৃতি লাভের এক মাত্র পন্থা বলে প্রতীয়মান হলো।

প্রিন্স সাঈদ হালিম পাশার রচিত সারগর্ভ পুস্তক 'ইসলাম লাশমাক' প্রভৃতি সাম্প্রতিক কালের অধিকতর চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থরাজি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করলো যে, আধুনিক চিন্তাধারা অনুযায়ী ইসলামী শরীয়ত প্রগতির পরিপন্থী নয়, কিন্তু এ সব আত্মপ্রকাশ করে অত্যন্ত বিলম্বে, বহুসংখ্যক মুসলিমের মধ্যে পাশ্চাত্যের অন্ধ উপসনা প্রকট হয়ে দেখা দেবার পর। এ সব গ্রন্থের প্রতিষেধক ফল প্রতিরোধ করা হলো কতকগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমা ভিক্ষার মনোভাবে পরিপূর্ণ দালালী (apologetic) সাহিত্য দিয়ে। তাতে ইসলামের বাস্তব শিক্ষাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করা হলো না, বরং দেখাতে চেষ্টা করা হলো যে, ইসলামী শরীয়ৎকে পাশ্চাত্য দুনিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারণা দ্বারা চালিত করা যেতে পারে। এতে মুসলিমদের পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুকরণের পক্ষে আপাতঃ যুক্তি দাঁড় করানো হলো এবং সর্বদা ইসলামী প্রগতির ছদ্মনামে ধীরে ধীরে ইসলামী সমাজ-নীতিকে অস্বীকার করার পথ রচিত হলো। ইসলামের এই অস্বীকৃতি আজকের দিনের কয়েকটি অতি প্রগতিশীল দেশে ক্রমবিকাশে সুস্পষ্ট দাগ কেটে রেখেছে। আমরা কিভাবে জীবন যাপন করি, ইউরোপীয় পোষাক পরিধান করি, অথবা পৈত্রিক পোষাক পরিধান করি, আমাদের চাল চলনে রক্ষণশীল হই বা না হই, আত্মিক দিক দিয়ে তার কোনো ফল নেই বলে মুসলিম 'সুধীমন্ডলীর' অনেকে যে যুক্তি পেশ করে থাকে, তা' নিরর্থক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মানুষ যতক্ষণ তার ধর্মীয় বিধি-বিধান লংঘন করে কাজ না করে, ততক্ষণ ইসলাম তার জন্য স্বীকার করে

www.pathagar.com

সম্ভবনার বিপুল বিরাট ক্ষেত্র। নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা অথবা অর্থ নৈতিক কার্য কলাপের ভিত্তি হিসাবে মুলধনের ওপর সূদ আদান-প্রদান প্রভৃতি যে সব জিনিষকে পাশ্চাত্য সামাজিক কাঠামোর অপরিহার্য অংগ হিসাবে ধরা হয়, তা' ছাড়াও পশ্চিমী সভ্যতার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি মানব-মনের ধর্মীয় গঠনের নিশ্চিত বিরোধী, তা' আমি আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি। কেবল কৃত্রিম ধারণা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই বিশ্বাস করতে পারে যে, কোনো সভ্যতার প্রাণবস্তুর দ্বারা প্রভাবিত না হয়েই তার বাইরের রূপের অনুকরণ করা সম্ভব। সভ্যতা কেবল একটা শূণ্যগর্ভ রূপ নয়, বরং সে হচ্ছে একটা জীবন্ত উদ্যম। যখনই আমরা তার বাইরের রূপকে গ্রহণ করতে শুরু করি, তখনই তার অন্তর্নিহিত ধারা ও চলিষ্ণু প্রভাব আমাদের ভিতরে কাজ করতে থাকে এবং ধীরে অলক্ষ্যে আমাদের সমগ্র মানসিক প্রবণতাকে রূপ দিতে থাকে।

এই অভিজ্ঞতার পূর্ণ উপলব্ধি নিয়েই হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেনঃ

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ـ

"যে কোনো লোক অপর জাতির অনুকরণ করে, সে হয় তাদেরই অন্তর্গত।"[২]

এই বিখ্যাত হাদীস কেবল এক নৈতিক আভাস মাত্র নয়; বরং এ হচ্ছে এক উদ্দেশ্যমূলক উক্তি, যাতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোনো অ-মুসলিম সভ্যতার বাইরের রূপ অনুকরণের ফলে মুসলিমের পক্ষে—তারই মধ্যে আত্মবিলোপ অবশ্যম্ভাবী।

এ সম্পর্কে সামাজিক জীবনের 'জরুরী' ও 'মামুলী' দুই দিকের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। ব্যাপারে কিছুই জরুরী নয়। পোষাকের মতো ব্যাপার গুলো নিছক 'বাইরের' এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিগত ও আত্মিক সত্তার ওপর তার কোনো প্রভাব

www.pathagar.com

নেই– এরূপ মনে করার চাইতে বড় ভুল আর কিছুই নেই। পোষাক–পরিচ্ছদ সাধারণভাবে একটা জাতির বিশেষ দিকে চালিত রুচির যুগ যুগ ব্যাপী বিকাশের পরিণতি। পোষাকের ফ্যাশন নির্ধারিত হয় সেই জাতির রুচিসংক্রান্ত ধারণা ও তার প্রবণতা হিসাবে। জাতির জীবনে চরিত্র ও প্রবণতার যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তদনুসারে পোষাক–পরিচ্ছদের রূপ নির্ধারিত ও পরিবর্তিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আজকের দিনের ইউরোপীয় ফ্যাশন সম্পূর্ণরূপে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিগত ও নৈতিক চরিত্রেরই অনুরূপ। ইউরোপীয় পোষাক পরিধান করলে যে কোনো মুসলিম অচেতনভাবে নিজের রুচিকে ইউরোপীয় রুচির সাথে খাপ খাইয়ে নেয় এবং নতুন পোষাকের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো পন্থায় সে তার নিজস্ব বুদ্ধিবৃদ্ধিগত ও নৈতিক সত্তাকে বিকৃত করে তোলে। এই পন্থা অবলম্বন করতে গিয়ে সে তার নিজ জাতির সাংস্কৃতিক সম্ভবনা অস্বীকার করে তাদের চিরাচরিত রুচি, সৌন্দর্যবোধের মান, তাদের পসন্দ–অপসন্দ এবং পরিধান করে বিদেশী সভ্যতার প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত ও নৈতিক দাসতের উর্দি।

যদি কোনো মুসলিম ইউরোপীয় পোষাক, চাল–চলন জীবন পদ্ধতি অনুকরণ করে, তা দিয়ে সে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি তার মানসিক আকর্ষণই প্রকাশ করে, বাইরে তার বিঘোষিত মতবাদ যা'ই হোক না কেন। কোনো বিদেশী সভ্যতার প্রাণবস্তুকে গ্রহণ না করে বুদ্ধিবৃত্তি ও সৌন্দর্যানুভূতির ক্ষেত্রে তার অনুকরণ করা বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব। তেমনি আবার জীবন সম্পর্কিত ধর্মীয় দৃষ্টিভংগির বিরোধী কোনো সভ্যতার প্রাণবস্তুকে গ্রহণ করে তারপরও সৎ মুসলিম হিসাবে নিজের পরিচয় দেওয়া সমভাবেই অসম্ভব।

কোনো বিদেশী সভ্যতার অনুকরণ–প্রভৃতি হচ্ছে হীনমন্যতদারই পরিনতি। যে–সব মুসলিম পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণ করে, তাদের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তি, কারিগরী নৈপুণ্য ও বাইরের চাকচিক্যের সাথে ইসলামী দুনিয়ার

www.pathagar.com

শোচনীয় দুর্দশার তুলনা করে; এবং তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, আমাদের যুগে পাশ্চাত্য পন্থা অবলম্বন ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। আমাদের নিজস্ব ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ইসলামের নিন্দা করাটা আজকের দিনের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বড়জোর এক ধরণের কৈফিয়তের মনোভাব অবলম্বন করে নিজেদের ও অপরের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা করে থাকেন যে, ইসলামের সাথে পশ্চিমী সভ্যতার বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে।

ইসলামের পূনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে কোনোরূপ সংস্কার-ব্যবস্থা অবলম্বনের আগে মুসলিমদের তাদের ধর্মের স্বপক্ষে কৈফিয়ৎ পেশ করার মনোভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করা হবে। মুসলিমকে তার মাথা উঁচু রেখে বাঁচতে হবে। তাকে উপলব্ধি করতে হবে, বাকী দুনিয়া থেকে সে আলাদা স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ; এবং সে স্বাতন্ত্র্যের জন্য গৌরব বোধ করতে হবে। মূল্যবান গুণ হিসাবে তাকে এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং তাকে কৈফিয়ৎ দেবার ও অপর সাংস্কৃতিক মহলের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টার পরিবর্তে দুনিয়ার কাছে বলিষ্ঠভাবে এই স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, মুসলিমরা নিজেদেরকে বাইরের আহ্বান থেকে দূরে রাখবে। ব্যক্তিবিশেষ তার নিজস্ব সভ্যতাকে বিনষ্ট না করে বিদেশী সভ্যতার নতুন সুনির্দিষ্ট প্রভাব সব সময়েই গ্রহণ করতে পারে। ইউরোপীয় রেনেসাঁও এই ধরণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা সেখানে দেখেছি, শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষা পদ্ধতিতে ইউরোপ কত সহজে আরব-প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু তারা কখনো আরবীয় সংস্কৃতির বাইরের রূপ ও প্রাণবস্তুকে অনুকরণ করেনি এবং কখনো তার নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি ও সৌন্দর্যবোধের স্বাধীনতা বিসর্জন দেয়নি। তারা তাদের নিজস্ব ভূমিকে উর্বর করার জন্য আরবীয় প্রভাবকে ব্যবহার করেছে, ঠিক যেমন করে আরবরা তাদের উত্থান যুগে হেলেনীয় প্রভাবকে কাজে লাগিয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই ফল হয়েছে নিজস্ব আত্মবিশ্বাস ও গর্বের অধিকারী এক জাতীয় সভ্যতার

www.pathagar.com

বলিষ্ঠ নব বিকাশ। এই গর্ব ও নিজস্ব অতীতের সম্পর্ক হারিয়ে কোনো সভ্যতা সমৃদ্ধ হতে পারে না; এমন কি, তার অস্তিত্বও বজায় রাখতে পারে না।

কিন্তু ইসলামী দুনিয়ায় ইউরোপকে অনুকরণের এবং পাশ্চাত্য ধারণা ও আদর্শ আত্মস্থ করার যে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাতে ধীরে ধীরে অতীতের সাথে তার সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হচ্ছে এবং ফলে সে কেবল তার সাংস্কৃতিক নয়, আত্মিক ভিত্তিভূমিও হারিয়ে ফেলছে। সেই বৃক্ষের সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে, আর শিকড় গভীরভাবে ভূমির সাথে যুক্ত থাকা পর্যন্ত ছিলো বলিষ্ঠ ; কিন্তু পশ্চিমী সভ্যতার পার্বত্য স্রোতধারা বয়ে এসে তার শিকড় ধুয়ে নিয়ে গেছে ভূমির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে; এবং বৃক্ষটি এখন পুষ্টির অভাবে ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ হয়ে যাচ্ছে, তার পাতাগুলি ঝরে পড়ছে, শাখাগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে; পরিণামে বৃক্ষকান্ডটিও পতনের বিপদ সম্ভাবনার সম্মুখীন হচ্ছে।

বাস্তব ধর্ম নৈতিক আবেদনহীন নিষ্প্রাণ রীতিতে পরিণত হওয়ার ফলে ইসলামী জাহান যে মানষিক ও সামাজিক জড়তার পর্যায়ে নেমে গেছে, পশ্চিমী সভ্যতা তা' থেকে তার পুণরুজ্জীবনের সঠিক পন্থা হতে পারে না। এমতাবস্থায় আজকের দিনে জরুরী প্রয়োজনীয় আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত প্রেরণার জন্য মুসলিম সমাজ আর কোন দিকে তাকাবে?

এর জবাব প্রশ্নের মতোই সহজ। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে যে জবাব। ইতিপূর্বে বহুবার বলা হয়েছে যে, ইসলাম কেবল একটি অন্তরের বিশ্বাস মাত্র নয়' বরং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের এক সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত কর্মসূচী অপরিহার্যরূপে স্বতন্ত্র মৌলিক ভিত্তিযুক্ত বিদেশী সভ্যতাকে আত্মস্থ করে তাকে ধ্বংস করা যেতে পারে। সমভাবেই তাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে। ঠিক সেই

www.pathagar.com

মূহূর্তে, যখন তাকে নিজস্ব বাস্তবতার পথে ফিরিয়ে এনে সকল দিক দিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্তিত্ব নির্ধারণ ও রূপায়ণের উপাদান হিসাবে মূল্য দেওয়া যাবে।

আমাদের এ যুগের প্রচলিত নতুন নতুন ধারণা ও পরস্পর বিরোধী সাংস্কৃতিক প্রভাবের সংঘর্ষের মাঝখানে ইসলাম অতঃপর আর শূণ্যগর্ভ রূপ নিয়ে টিকে থাকতে পারে না। বহু শতাব্দীর যাদুর ঘুম তার ভেঙ্গে গেছে। তাকে জাগাতে হবে, অথবা মরতে হবে। আজকের মুসলিমদের সমস্যা সেই পথচারীর সমস্যার মতো যে, এসে দাঁড়িয়ে একে তেরাস্তার মোড়ে; সে সেখানে আছে, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাতে আর অনশন মৃত্যু অবধারিত। 'পশ্চিমী সভ্যতার পথে' চিহ্নিত রাস্তা সে ধরতে পারে; কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাকে চির দিনের জন্য বিদায় নিতে হবে তার অতীত থেকে। অথবা সে আর একটি রাস্তা ধরতে পারে, যার ওপর লেকা রয়েছে 'ইসলামের বাস্তাবতার পথে'। নিজস্ব অতীতের প্রতি যারা বিশ্বাসী এবং যারা সে অতীতকে এক জীবন্ত ভবিষ্যতে রূপদানের সম্ভবনায় বিশ্বাস করে, এই একটি মাত্র পথের আহ্বানেই তাদের মনে সাড়া জাগাতে পারে।

www.pathagar.com

হাদীস সুন্নাহ্

গত কয়েক দশকে বহুসংখ্যক সংস্কার-প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে এবং বহু আত্মিক চিকিৎসক ইসলামের রুগ্ন দেহের জন্য পেটেন্ট ওষধ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে; কারণ চতুর ডাক্তারেরা অন্ততঃ আজকের দিনে যাদের কথা লোকে শোনে-তাঁদের পুষ্টিকর ও জীবনী শক্তি বর্ধক ওষধের সাথে সাথে এমন সব স্বাভাবিক পথ্যের ব্যবস্থা করেননি, যার ওপর ভিত্তি করে রোগীর প্রাথমিক বিকাশ সম্ভব হয়েছিলো। যে মাত্র পথ্য ইসলাম রুগ্ন অথবা সুস্থ দেহে গ্রহণ ও আত্মস্থ করতে পারে, তা' হচ্ছে আমাদের রাসুলে করীম হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর সুন্নাহ্। তেরো শতাধিক বছর আগে ইসলামের উত্থানের অর্থ উপলব্ধির কুঞ্জি হচ্ছে এই সুন্নাহ্; এবং আজকের দিনে আমাদের পতনের অর্থ উপলব্ধির কুঞ্জিই বা সে কেন হবে না? সুন্নাহ পালন হচ্ছে ইসলামের অস্তিত্ব ও অগ্রগতির সমার্থক। তেমনি সুন্নাহর প্রতি উপেক্ষাও ইসলামের বিনাশ ও ধ্বংশের সামর্থক। সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামী সৌধের লৌহকাঠামো; এবং সৌধ থেকে কাঠামো সরিয়ে ফেললে তা' তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়লে তাতে বিস্মায়ের কোনো কারণ আছে কি?

এই সহজ সত্য-ইসলামী ইতিহাসে সকল সুধীব্যক্তি কর্তৃক সর্বসম্মতরূপে স্বীকৃত এই সহজ সত্য যে পশ্চিমী সভ্যতার ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব-সংশ্লিষ্ট কারণে আজকের দিনে জনগনের নিকট অত্যধিক অপ্রিয় হয়ে পড়েছে, তা আমরা ভালো করেই জানি। তথাপি, এই হচ্ছে অমোঘ সত্য-একমাত্র সত্য , যা আমাদেরকে বর্তমান পতনযুগের বিশৃংখলা ও লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে পারে। 'সুন্নাহ' শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাপকতম অর্থে। সুন্নাহ বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে রাসুল

www.pathagar.com

করীম (সঃ)–এর কাজে ও কথায় আমাদের সামনে উপস্থাপিত আদর্শ। তাঁর বিচিত্র জীবন ছিলো কুরআন শরীফের জীবন্ত দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যা; এবং পবিত্র গ্রন্থের বাণীবাহক হিসাবে তাঁর অনুসরণ ব্যতীত আমরা কুরআন শরীফকে শ্রেষ্ঠতর মর্যাদা দান করতে পারি না।

আমরা দেখেছি যে, ইসলামের প্রধান কৃতিত্ব সমূহের অন্যতম যা তাকে অন্যান্য লোকাত্তর বিধান থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে, তা হচ্ছে মানব–জীবনের নৈতিক ও বাস্তব দিকের সমন্বয় সাধন। এই সব কারণেই ইসলাম তার উত্থান যুগে যেখানেই আবির্ভূত হয়েছে, সেখানেই অর্জন করেছে বিজয় গৌরব। ইসলাম মানব–জাতির কাছে এক নতুন বার্তা বহন করে এনেছে যে, বেহেশতের অধিকার লাভের জন্য তাকে দুনিয়াকে উপেক্ষা করতে হবে না। ইসলামের এই প্রধান বৈশিষ্ট্য থেকেই বোঝা যায়, কেন আমাদের নবী (সঃ) মানব–জাতির কাছে আল্লাহর প্রেরিত পথপ্রদর্শক হিসাবে আত্মিক ও বাস্তব উভয় দিকের মেরু প্রবণতায় মানব–জীবনের সাথে এত গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তি বিশেষ হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)–এর নিছক ইবাদাত ও আত্মিক বিষয় সংক্রান্ত নির্দেশ এবং আমাদের সমাজ ও দৈনন্দিন জীবন সংক্রান্ত প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানলে তাতে ইসলাম সম্পর্কে তার গভীর উপলব্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় না। "আমরা প্রথম শ্রেণীর আদেশসমূহ মেনে চলতে বাধ্য কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর আদেশসমূহ মেন বলতে বাধ্য নই", এ মতবাদ এরূপ ধারণার মতোই কৃত্রিম ও প্রাণবস্তুর দিক দিয়ে ইসলামের বিরোধী যে, কুরআন শরীফের কোনো সাধারণ নির্দেশ নাযিল হওয়ার সময়ে কেবল অজ্ঞ আরবদের জন্যই নাযিল হয়েছিলো, বিশ শতকের রুচিবান ভদ্রলোকদের জন্য নয়। এর মূলে রয়েছে মোস্তফা (সাঃ)–এর নবুয়তের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা আরোপ না করার বিচিত্র মনোভাব।

মুসলিম জীবনকে তার আত্মিক ও দৈহিক সত্তার পূর্ণ সহযোগিতার ভিতর দিয়ে চালিত করতে হবে বলেই নৈতিক ও বাস্তব,

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল দিকের সমন্বয়ে এক জটিল সত্তা হিসাবে সমগ্র জীবনের ওপর হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর নেতৃত্ব প্রযোজ্য। এই-হচ্ছে সুন্নাহর গভীরতম তাৎপর্য।

কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۔

'রসূল তোমাদেরকে যা কিছু নির্দেশ দেন, পালন কর; আর যা' কিছু নিষেধ করেন, বর্জন কর'। (সূরা ৫৯ঃ৭)

রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেনঃ

تَفَرَّقَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى اَحَدٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارٰى عَلٰى اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَسَتَتَفَرَّقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً ۔

'ইহুদীরা বিভক্ত হয়েছে একাত্তর ফির্‌কায়, নাসারারা বিভক্ত হয়েছে বাহাত্তর ফির্‌কায়, আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর ফির্‌কায়।'৩

এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রচলিত আরব রীতি অনুযায়ী ৭০ সংখ্যাটিতে কখনো কখনো 'বহু' বুঝায় এবং উপরিউক্ত গাণিতিক সংখ্যাটিই প্রকৃত পক্ষে বুঝায় না। সুতরাং রাসূলে করীম (সঃ) স্পষ্টতঃ বলতে চেয়েছেন যে, মুসলিমদের মধ্যে মাযহাব ও দলের সংখ্যা হবে অত্যধিক; এমন কি, ইহুদী ও নাসারাদের চাইতেও বেশী। তারপর তিনি বলেছেনঃ

كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً

"এক ব্যতীত অন্যান্য সকলেরই গতি হবে জাহান্নামের অগ্নিগর্ভে।"

৩। সুনান্ আবি দাউদ, জামিয়াত তিরমিযী, সুনান্ আদ্-দারিমী, মুসনদ ইবনে হাম্বল।

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরাম যখন প্রশ্ন করলেন, সেই সঠিক পথানুযারী ভাগ্যবান দর কোনটি, তখন জবাবে তিনি বললেনঃ

مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ ـ

'যে (দলটি) আমার ও আমার আসহাবের নীতির ভিত্তিযুক্ত।'

কুরআন শরীফের কোনো কোনো আয়াতে বিষয়টি এমনভাবে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, তাতে আর কোন ভুল ধারণার অবকাশ নেইঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا- ـ

"না, আপনার প্রভুর শপথ (হে মোহাম্মদ!) ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের মধ্যে বিরোধের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করে এবং আপনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে কোনো অপসন্দ প্রকাশ না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করে।' (সূরা ৪ঃ৬৫)

আবারঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ - ـ

'বলুন, (হে মোহাম্মদ!) যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, আমার অনুসরণ করঃ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেনঃ এবং আল্লাহ মার্জনাকারী, করুণা বিতরণকালী। বলুনঃ আল্লাহকে ও রাসূলকে মেনে চলো। কিন্তু যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, (জেনে রাখুন) আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসেন না।' (সূরা ৩ঃ৩১,৩২)

www.pathagar.com

সুতরাং হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সুন্নাহ মর্যাদার দিক দিয়ে কুরআন শরীফের পরবর্তী স্থানের অধিকারী, সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচরণ সংক্রান্ত ইসলামী কানুনের দ্বিতীয় উৎতস। প্রকৃতপক্ষে, সুন্নাহকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে কুরআন শরীফের শিক্ষার একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হিসাবে-ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিরোধ এড়ানোর ও তাকে বাস্তবে কার্যকরী করার একমাত্র পন্থা হিসাবে। কুরআন শরীফের বহু আয়াতের রূপক অর্থ রয়েছে এবং সঠিক বিশ্লেষণ-প্রণালী না থাকলে তাকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে উপলব্ধি করা যেতে পারে। তা' ছাড়া এমন কতকগুলি বাস্তব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, কুরআন শরীফে যার সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। পবিত্র গ্রন্থের ভাবধারা নিশ্চিতরূপে সর্বত্র সমরূপবিশিষ্ট; কিন্তু তা' থেকে প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের অবলম্বনীয় বাস্তব মনোভাব নির্ধারণ খুব সহজ কাজ নয়। যতোক্ষণ আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মহাগ্রন্থ আল্লাহ্‌র বাণী-রূপ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ; ততোক্ষণ আমাদের জন্য একমাত্র ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, তা' কখনো রসূলে করীমের সুন্নাহ্‌তে সন্নিবিশিত নির্দেশ ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে প্রযুক্ত হতে পারে না। কুরআন শরীফের সাথে সর্বকালের জন্য হযরত রাসূলে করীমের প্রেরণাদায়ক ও পথনির্দেশকারী ব্যক্তিত্বের সংযোগের কারণ পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে। বর্তমান অধ্যায়ে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি যথেষ্ট হবে, মনে করি। আমাদের যুক্তি অনুযায়ী যার মারফতে কুরআন শরীফের শিক্ষা-মানবজাতির কাছে নাযিল হয়েছে, তাঁর চাইতে সে শিক্ষার আর কোনো শ্রেষ্ঠ বিশ্লেষণকারী সম্ভবতঃ হতেই পারেন না।

'আমরা কুরআন শরীফের দিকে প্রত্যাবর্তন করবো, কিন্তু সুন্নাহর দাসত্বসূচক অনুসরণ করবো না'ঃ এই ধরণের যে সব শ্লোগান আমাদের এ যুগে বার বার শোনা যায়, তাতে কেবল ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। এই ধরণের কথা যারা বলে, তাদের তুলনা করা চলে

www.pathagar.com

কেবল সেই লোকের সাথে, যে কোন প্রাসাদে প্রবেশ করতে চায়, কিন্তু প্রাসাদদ্বার উন্মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনী সঠিক চাবিটি ব্যবহার করতে চায় না।

যে সকল উৎসের মাধ্যমে রাসূলে করীম (সঃ)–এর জীবন কথা ও বাণী আমাদের সামনে হাযির হয়েছে, তার নির্ভরযোগ্যতার জরুরী প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনার অবতারণা করবো। এই উৎসসমূহ হচ্ছে আহাদীস, সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক বর্ণিত রাসূলে করীম (সঃ)–এর বাণী ও কার্যকলাপের বিবরণ। এগুলো ইসলামের প্রথম কয়েক শতকের সমালোচনার ভিত্তিতে সংগৃহীত হয়েছে। বহু আধুনিক মুসলিম বলে বসেন, তাঁরা সুন্নাহ অনুসরণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁরা মনে করেন যে, যে সব আহাদীসের উপর তার ভিত্তি, তার উপর তাঁরা নির্ভর করতে পারেন না। নীতির দিক দিয়ে হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা এবং পরিণামে সুন্নাহর সম্পূর্ণ কাঠামো অস্বীকার করা আমাদের একালে এক ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে।

এই মনোভাবের কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কি? ইসলামী কানুনের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসাবে হাদীসকে আগ্রাহ্য করার কোনো বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা থাকতে পারে?

আমাদের মনে করা উচিত, গোঁড়া চিন্তাধারার বিরোধীগণ প্রকৃতপক্ষে এমন বিশ্বাস্য যুক্তি পেশ করতে পারবেন, যা' দিয়ে চূড়ান্তভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর হাদীসমূহের নির্ভরযোগ্যতার অভাব প্রমাণিত হবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তার বিপরীত। দলগতভাবে হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ প্রদানের সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক সমালোচকগণ তাঁদের খোশখেয়াল প্রসূত সমলোচনার স্বপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমর্থন দাঁড় করাতে পারেন নি। তেমন কোনো সমর্থন দাঁড় করানো বরং কষ্টকরই হবে, কারণ প্রাথমিক যুগের হাদীস সংগ্রাহকবৃন্দ, বিশেষ করে ইমাম বুখারী

www.pathagar.com

ও মুসলিম প্রতিটি হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের জন্য মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য কঠিনতম পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন। ঐতিহাসিক দলীলের ব্যাপারে সাধারণতঃ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা যেভাবে পরীক্ষা চালান, তাঁদের পরীক্ষা তার চাইতেও কঠিনতর ছিল।

প্রাথমিক যুগের মুহাদ্দেসগণ হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা অনুসন্ধানের জন্য যে সুচিন্তিত পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, তার বিস্তারিত আলোচনা করতে যাওয়া এ নিবন্ধের সীমাবদ্ধ স্থানে সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এর আহাদীসের তাৎপর্য, রূপ ও বর্ণনার ধারা সম্পর্কে গবেষণার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে একটি পূর্ণাংগ বিজ্ঞান। হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে যাঁদের উল্লেখ আছে, এরূপ সকল ব্যক্তির জীবন-কথা নিয়ে এক অচ্ছেদ্য শৃংখল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন এই বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক শাখা। এইসব নরনারীর জীবন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সকল দিক দিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে, এবং কেবল তাঁদের নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে, যাঁদের জীবন পদ্ধতি ও হাদীস বর্ণনার ধারা বিখ্যাত মুহাদ্দেসগণ কর্তৃক নির্ধারিত মানের সাথে পুরোপুরি খাপ খেয়েছে এবং তাঁদেরকেই সর্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরা হয়েছে। সুতরাং আজকের দিনে যদি কেউ কোনো বিশেষ হাদীস অথবা হাদীসমষ্টির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে চান, তা' হলে সেগুলোর অসত্যতা প্রমাণের ভার কেবল তাঁরই উপর পড়বে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে কোনো ঐতিহাসিক সূত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা যেতে পারে না, যতোক্ষণ না সন্দেহপ্রকাশকারী ব্যক্তি প্রমাণ করতে প্রস্তুত হন যে, সেই বিশেষ সূত্রটি ত্রুটিযুক্ত। কোনো হাদীসের সূত্রের সত্যতার বিরুদ্ধে অথবা পরবর্তী দু'একজন বর্ণনাকারীর বিরুদ্ধে যদি কোনো সংগত বৈজ্ঞানিক যুক্তি না পাওয়া যায় এবং অপরদিকে যদি একই বিষয় সম্পর্কে কোন বিতর্কমূলক বর্ণনার অস্তিত্ব না থাকে, সেরূপ ক্ষেত্রে আমরা সে, হাদীসের সত্য বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য।

www.pathagar.com

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরে নেওয়া যেতে পারে, গজনীর সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের কাহিনী যখন কেউ উত্থাপন করেন, তখন আপনি যদি হঠাৎ উঠে বলেনঃ 'আমি বিশ্বাস করি না যে, মাহমুদ কখনো ভারতে এসেছিলেন, এটা ঐতিহাসিক ভিত্তিবর্জিত কাল্পনিক কাহিনীমাত্র; সে ক্ষেত্রে কি ব্যাপার ঘটবে? মাহমুদ ভারতে এসেছিলেন, এই তথ্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হিসাবে তাঁর সমসাময়িক বর্ণিত সময়ানুক্রমিক ঘটনাবলী ও ইতিহাস উদ্ধৃত করে আপনার ভুল ভাঙতে এগিয়ে আসাবেন কোনো ইতিহাস-অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আপনাকে সে প্রমাণ মেনে নিতে হবে-অন্যথায় আপনি বিবেচিত হবেন সুস্পষ্ট কারণ ব্যতীত সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য অস্বীকারকারী বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি বলে। এই-ই যদি হয় ব্যাপার, তা' হলো মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে, হাদীস সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাপারেও কেন আমাদের আধুনিক সমালোচকরা তেমনি ন্যায় শাস্ত্রসংগত সুস্থ মানসিকতার পরিচয় দেন না?

কোনো হাদীস মিথ্যা হবার প্রাথমিক কারণ হতো পারে প্রথম উৎস অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সাহাবা অথবা পরবর্তী বর্ণনাকারীদের ইচ্ছাকৃত মিথ্যাভাষণ। সাহাবাদের সম্পর্কে তেমন কোনো সম্ভাবনা গোড়া থেকেই অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। নিছক কল্পনার ক্ষেত্রে এই ধরণের অনুমানের সম্ভাবনা দূর করতে হলে সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে কিছুটা অন্তদৃষ্টি প্রয়োজন। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) -এর ব্যক্তিত্ব এসব নরনারীর অন্তরে যে বলিষ্ঠ রেখাপাত করেছিলো, তা' আজ মানব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সত্য, অধিকন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রয়েছে তার বলিষ্ঠ দলিল। একি কল্পনাও করা যায় যে, যে-মানুষেরা রাসূলে খোদার ইংগিত নিজেদের জীবন ও যথাসর্বস্ত কুরআন করতেও রাযী ছিলেন, তাঁরা তাঁর বাণী নিয়ে ফাঁকিবাজী খেলছেন? নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ

مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

www.pathagar.com

'যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা প্রচার করে, সে স্থান লাভ করবে জাহান্নামের অগ্নিগর্ভে।'

সাহাবায়ে কেরাম এ হাদীস জানতেনঃ আল্লাহর বাণীবাহক হিসাবে তাঁরা রাসূলে করীম (সঃ) –এর বাণীর উপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস স্থাপন করতেন। তাই মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে এ কি সম্ভব হতে পারে যে, তাঁরা এই সুস্পষ্ট নির্দেশটি অমান্য করেছিলেন?

ফৌজদারী আদালতের বিচারে বিচারকের সামনে প্রথম বিচার্য প্রশ্ন হল– Cui bono–কার উপকারের জন্য অপরাধটি করা হতে পারে। এই বিচার বিভাগীয় নীতি হাদীসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। যে–সব হাদীস প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ ব্যক্তি বা দলসমূহের স্বার্থসংশ্লিষ্ট – দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রাসূলে করীম (সঃ)–এর ওফাতের পরবর্তী এক শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক দাবীসংক্রান্ত যে–সব কৃত্রিম হাদীস অধিকাংশ মুহাদ্দেস আগ্রাহ্য করেছেন, তা' ছাড়া রাসূলে করীম (সঃ)–এর অন্যান্য হাদীসের মিথ্যা বর্ণনায় কোনো ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে কোনো লাভজনক কারণ থাকতে পারে না। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হাদীসমূহ উদ্ভাবনের সম্ভাবনা থাকতে পারে, এই সত্য উপলব্ধি করেই হাদীস সংগ্রাহকদের মধ্যে দুই প্রধান ব্যক্তি ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের হাদীস–সংগ্রহে দলীয় রাজনীতিসংক্রান্ত সকল হাদীসই বাদ দিয়েছেন। অবশিষ্ট যা' রয়েছে, সে–সব সম্পর্কে কারুর ব্যক্তিগত সুবিধা দানের সন্দেহ ওঠতে পারে না।

আরো একটি যুক্তি রয়েছে, যারা উপর নির্ভর করে হাদীসের প্রামাণতা চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। এরূপ ধারণা করা যায় যে, রাসূলে করীমের মুখের বাণী শ্রবণকারী সাহাবায়ে কেরাম অথবা কোনো না কোনো পরবর্তী বর্ণনাকারী নিজেরা সত্যভাষী হওয়া সত্ত্বেও রাসূলের বাণী সম্পর্কে ভুল বোঝা অথবা স্মৃতিভ্রংশ অথবা অন্যবিধ মনস্তাত্ত্বিক কারণে ভুল করে থাকতে পারেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক

www.pathagar.com

সাক্ষ্য অন্ততঃ সাহাবায়ে কেরামের দ্বারা অনুরূপ ভুলের বিশেষ সম্ভাবনার বিরুদ্ধেই প্রমাণ করে। রাসূলে করীম (সঃ) এর যাঁরা সাথী ছিলেন, তাঁদের কাছে তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজছিলো অত্যাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। তা' কেবল তাদের উপর তাঁর ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ প্রভাবের দরুনই নয়, বরং তাঁদের এই দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেও যে রাসূলে করীম (সঃ) এর নির্দেশ ও দৃষ্টান্ত অনুযায়ী নিজেদের জীবনের খুটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, এই-ই হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা। সুতরাং তাঁরা বাণীর প্রশ্নকে অসতর্কভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি, বরং বহু ব্যক্তিগত অসুবিধার বিনিময়েও তাঁরা সে বাণী স্মৃতিতে সংরক্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন। জানা যায় যে, যে সব সাহাবা হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরা দু'জন করে এক একটি দল গঠন করে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে একজন যখন রাসূলে করীমের পাশে থাকতেন, অপর ব্যক্তি তখন জীবীকা অর্জন বা অন্যবিধ কার্যে লিপ্ত হতেন। রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে তাঁরা যা কিছু শুনতেন বা দেখতেন, তা' পরস্পরকে জানাতেন। পাছে রাসূলে করীমের কোনো বাণী বা কার্য তাদের লক্ষ্য এড়িয়ে যায়, সে জন্য তাঁরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকতেন। এটা মোটেই সম্ভাব্য নয় যে, এরূপ মনোভাব থাকা সত্ত্বেও তারা কোন হাদীসের সঠিক বাণী সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে থাকবেন। শত শত সাহাবার পক্ষে যদি সম্পূর্ণ কুরআন শরীফের বাণী বানান-পদ্ধতির ক্ষুদ্রম খুটিনাটি বিষয়সহ স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়ে থাকে, তা' হলো তাঁদের অব্যবহিত পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে নিঃসন্দেহে রাসূলে করীমের প্রতিটি হাদীস কোনেরূপ সংযোজন বা বিযোজন ব্যতীত স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা সমভাবে সম্ভব ছিলো।

অধিকন্তু হাদীস সংগ্রাহকগণ বিভিন্ন স্বতন্ত্র বর্ণনাধারায় একই রূপে বর্ণিত হাদীসমূহের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্যতা আরোপ করেছেন। কেবল এতেই শেষ হয়নি। সহীহ্ (নির্ভুল) বলে ধরে নেবার আগে বর্ণনার প্রত্যেক পর্যায়ে প্রত্যেকটি হাদীস দুই বা ততোধিক অবাধ সাক্ষ্য

www.pathagar.com

দ্বারা সমর্থিত হতে হয়েছে, যাতে করে কোনো পর্যায়ে উক্ত বর্ণনা একটি মাত্র লোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে গৃহীত না হয়। সমর্থনের এই শর্ত এমন ব্যাপক ছিলো যে, সংশ্লিষ্ট সাহাবা ও চূড়ান্ত লিপিবদ্ধকারীর মধ্যে আনুমানিক তিন পর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে বিশজন বা ততোধিক বর্ণনাকারী এর সাথে জড়িত হয়েছেন।

এ সব সত্ত্বেও কোনো মুসলিম কখনো মনে করেননি যে, রসূলের হাদীসসমূহ কুরআন শরীফের অনুরূপ মর্যাদা বা চূড়ান্ত নির্ভরযোগ্যতার দাবীদার হতে পারে। হাদীসের সমালোচনামূলক অনুসন্ধান কখনো বন্ধ হয়নি। অসংখ্য কৃত্রিম হাদীসের যে অস্তিত্ব রয়েছে, ইউরোপীয় সমালোচকদের ধারণা অনুযায়ী এ সত্যটি কখনো আমাদের মুহাদ্দেসগণের মনোযোগে এড়িয়ে যায়নি। পক্ষান্তরে, নির্ভরযোগ্য ও কৃত্রিম হাদীসের মধ্যে সীমারেখা টানার উদ্দেশ্যেই হাদীসের সমালোচনামূলক বিজ্ঞানের আরম্ভ হয় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রতর হাদীস সংগ্রাহককে বাদ দিলেও ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই সমালোচনামূলক মনোভাবেরই প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং মিথ্যা হাদীসমূহের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হাদীসের ধারার বিরুদ্ধে কোনো সত্য প্রমাণ করে না। তাই সমসায়িক কালের ঐতিহাসিক বিবরণের নির্ভযোগ্যতার বিরুদ্ধে, সত্যি বলতে কি, আরব্য উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীর বেশী কিছু দাঁড় করানো যায় না।

শ্রেষ্ঠ হাদীস সংগ্রাহকগণের পরীক্ষার মান অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত হাদীসকে আজ পর্যন্ত কোনো সমালোচক ধারাবাহিকভাবে ভুল প্রমাণিত করতে পারেননি। নির্ভরযোগ্য হাদীসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে অগ্রাহ্য করার ব্যাপারটি এখন পর্যন্ত নিছক মতলবপ্রসূত এবং তা' নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কিন্তু আমাদের যুগের বহুসংখ্যক মুসলিমের মধ্যে এই বিরোধী মনোভাবের উদ্দেশ্য সহজেই খুঁজে বের করা যায়। আমাদের বর্তমান অধঃপতিত জীবন ও চিন্তাপদ্ধতিকে হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর

www.pathagar.com

সুন্নাহতে প্রতিফলিত ইসলামের ভাবধারা সাথে একই পর্যায়ে আনয়নের অসম্ভাব্যতাই –এর মূলীভূত উদ্দেশ্য। হাদীসের মিথ্যা সমালোচকরা তাদের নিজস্ব ও পারিপার্শ্বিকতার ত্রুটিবিচ্যুতির যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য সুন্নাহ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা দূর করতে চাচ্ছেন; এই কার্যটি করতে পারলেই তাঁরা তাঁদের মতলব মোতাবেক কৃত্রিম যুক্তিবাদের (rationalism) ধারায়–অর্থাৎ প্রত্যেকের নিজের ইচ্ছা ও মানসিব প্রবণতা অনুযায়ী–কুরআনের শিক্ষার ব্যাখ্যা করতে পারেন। এমনি করেই নৈতিক ও বাস্তব ব্যক্তিগত ও সমাজিক কানুন হিসাবে ইসলামের অন্যন্যা সাধারণ মর্যাদা চূর্ণ–বিচূর্ণ করা যেতে পারে।

আজকের দিনে যখন মুসলিম দেশসমূহে পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাব ক্রমবর্ধিত মাত্রায় অনুভূত হচ্ছে তখন এ ব্যাপারে 'তথাকথিত মুসলিম সুধী সমাজের' বিচিত্র মনোভাবের আরো একটি উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আমাদের পক্ষে রাসূলে করীম (সঃ) এর সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করা এবং একই সময়ে পাশ্চাত্য জীবন ধারা অনুসরণ করা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের বর্তমানে যুগের মুসলিমরা পাশ্চাত্যের যে কোনো জিনিষকে সাদরে বরণ করে নিতে, বিদেশী শক্তিশালী ও বাস্তবদৃষ্টিতে চাকচিক্যময় বলেই বিদেশী সভ্যতার পূজা করতে সদা প্রস্তুত। হযরত রাসূলে করীম (সঃ)–এর হাদীস সমূহ ও তার সাথে সাথে সুন্নাহর কাঠামো যে আজকের দিনে এতটা জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই 'পাশ্চাত্যকরণ' (westernisation) সুন্নাহ পশ্চিমী সভ্যতার অন্তর্নিহিত মৌলিক ধারণার এমন সুস্পষ্ট বিরোধী যে, পাশ্চাত্যের মোহে মুগ্ধ ব্যক্তিরা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে না বলে পারেন নাঃ সুন্নাহ অপ্রাসংগিক, সুতরাং ইসলামের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বাধ্যতামূলক নয়। কারণ তার ভিত্তি 'অবিশ্বাস্য হাদীসের উপর' এরপর তাদের কাছে পশ্চিম সভ্যতার ভাবধারার সাথে খাপ খাওয়ার মত যে কোনো পদ্ধতিতের কুরআনের শিক্ষা বিকৃত করার কার্যটি সহজতর হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

সুন্নাহ্‌র প্রাণবস্তু

হাদীসের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার মারফতে সুন্নাহর আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ আইনসংগত যৌক্তিকতা প্রমাণের মতোই তার আভ্যন্তীরণ আত্মিক যৌক্তিকতা প্রায় সম গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকার ইসলাম অনুসারী জীবন যাপনের জন্য সুন্নাহ্‌ পালন অপরিহার্য মনে করা হয় কেন? রাসূলে করীম (সঃ)-এর জীবনের দৃষ্টান্ত থেকে গৃহীত এসব কার্যকলাপ, রীতি, আদেশ ও নিষেধের কতকগুলো স্পষ্টতঃই তুচ্ছ ধরণের; অথচ এ বিরাট ধারার মাধ্যম ব্যতীত ইসলামের বাস্তবতায় পৌছবার কি আর কোনো পন্থা নেই? নিঃসন্দেহে তিনি মানবশ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিক খুটিনাটি বিষয়সহ তার জীবনের অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা কি মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়? এই পুরাতন আপত্তি ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচকরা সাধারণতঃ পেশ করে থাকে। তাদের কথা হচ্ছেঃ সুন্নাহকে কঠোরভাবে অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা ইসলামী জাহানের পরবর্তী পতনের অন্যতম প্রধান কারণ; কেননা এ ধরনের মনোভাব পরিণামে মানুষের কার্যকলাপের স্বাধীনতা ও সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে বলে মনে করা হয়। এই আপত্তির মোকাবিলা করতে পারা বা না পারাই ইসলামের ভবিষ্যতের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সুন্নাহ্‌ সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে আমাদের মনোভাবই ইসলামের প্রতি আমাদের ভবিষ্যৎ মনোভাব নির্ধারণ করবে।

ধর্ম হিসাবে ইসলাম ভাববাদী মতবাদের ভিত্তিযুক্ত নয়; বরং সেখানে যুক্তি ও সমালোচনামূলক অনুসন্ধানের পথ সদা উন্মুক্ত। এ জন্য আমরা গর্বিত এবং সুংগতভাবেই গর্বিত। সুন্নাহ পালনের যে দায়িত্ব

www.pathagar.com

আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের যে কেবল সেটুকুই জানবার অধিকার আছে, তা' নয়; বরং তা' চাপানোর মৌলিক যুক্তি উপলব্ধি করবারও অধিকার রয়েছে।

ইসলাম মানুষকে তার জীবনের সকল দিকের ঐক্যবিধানের পথে চালিত করে। সেই লক্ষ্যে পৌছবার পন্থা হিসাবে এ ধর্মে এমন এক ধারণা সমষ্টির সমন্বয় ঘটেছে, যাতে কোনো কিছুর সংযোজন বা বিয়োজন চলতে পারে না। ইসলামে সর্বমতের সমন্বয়ের (Eclecticism) স্থান নেই। যেখানেই এর শিক্ষাসমূহ কুরআন শরীফ বা রাসূলে করীম (সঃ) কর্তৃক ঘোষিত ব'লে নিশ্চিতরূপে জানা যাবে, সেখানে আমাদেরকে তা, মেনে নিতে হবে সমগ্রভাবে; অন্যথায় তার মূল্য থাকে না। যুক্তির ধর্ম হিসাবে ইসলামে ব্যক্তিগত নির্বাচনের পথ উন্মুক্ত – একথা মনে করা ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক ভ্রান্ত ধারণার প্রমাণ; যুক্তিবাদের চলতি ভ্রান্ত ধারণার ফলেই এরূপ দাবী সম্ভব হয়েছে। যুক্তি ও আজকের দিনের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী ''যুক্তিবাদের'' মধ্যে এমন এক বিরাট সাগরের ব্যবধান রয়েছে, যা' সর্বকালের দর্শন দ্বারা যথেষ্ট স্বীকৃত। ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে যুক্তির কাজ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণমূলক; মানব-মন যা' সহজে অর্থাৎ দার্শনিক বাগাড়ম্বরের সাহায্য ব্যতীত বহন করতে পারে না, এমন কিছু তার উপর চাপানো না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই তার কর্তব্য। ইসলামের বেলায় সংস্কারমুক্ত যুক্তি তাকে বারংবার জানিয়েছে অকুণ্ঠ আস্থাসূচক সমর্থন। তার অর্থ এ নয় যে, যে-কোনো লোক ইসলামের সংস্পর্শে গেলেই তার শিক্ষাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক ব'লে ধ'রে নেবে; এটা হচ্ছে প্রবণতা ও শেষ পর্যন্ত আত্মোপলব্ধির ব্যাপার। কিন্তু নিশ্চয়ই কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি এরূপ মত প্রকাশ করবে না যে, ইসলামের যুক্তিবিরোধী কোনো কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে এমন জিনিষ রয়েছে, যা' মানব-জ্ঞানের অতীত; কিন্তু কিছুই তার বিরোধী নয়।

আমরা আগেই দেখেছি, ধর্মীয় ব্যাপারে যুক্তির কার্য হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ধরণের-ক্ষেত্র বিশেষ ''হ্যাঁ'' বা না বলার। কিন্তু তথাকথি ''যুক্তিবাদের''

www.pathagar.com

কাজ তা নয়। তেমনি স্বীকৃতিদান ও নিয়ন্ত্রণেই তার কার্যের শেষ নয়, বরং তার পরেও সে লাফিয়ে চলে কল্পনার রাজ্যে; তা' নিছক যুক্তির (pure reasons) মতো ধারণক্ষম ও বিচ্ছিন্ন নয়, বরং অত্যাধিক মন্ময় ও প্রবণাত প্রধান। যুক্তি তার নিজস্ব সীমারেখা মেনে চলে, কিন্তু ''যুক্তিবাদ'' অসংগত দাবী নিয়ে সারা দুনিয়ার পরিব্যাপ্ত হতে চায়–তার নিজস্ব স্বতন্ত্র এলাকার সকল রহস্যের উপর জয়ী হতে চায়। ধর্মীয় ব্যাপারে যুক্তিবাদ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কোনো বস্তুবিশেষের মানব-জ্ঞানের অতীত হওয়ার সম্ভাবনাও ও স্বীকার করে না; কিন্তু এমতাবস্থায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং তার নিজের ক্ষেত্রেও এরূপ সম্ভবনা স্বীকার করা ন্যায়শাস্ত্রবিরোধী হয়ে দাঁড়ায়।

এই চিন্তাবিবর্জিত যুক্তিবাদের প্রতি বহু আধুনিক মুসলিমের অত্যাধিক ভক্তিই রাসূলে করীম (সঃ)-এর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করায় অসম্মতির অন্যতম কারণ। কিন্তু আজকের দিনে একথা প্রমাণ করতে কোনো ক্যান্টের (Kant) দরকার হয় না যে, মানব-জ্ঞান সম্ভাবনার দিক দিয়ে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ। আমাদের মন তার প্রকৃতি অনুযায়ী সমগ্রতার (totality) উপলব্ধি করতে অক্ষম; সব কিছুর মধ্যে আমরা কেবল তাদের খুঁটিনাটি দিক হৃদয়ংগম করতে পারি। আমরা জানি না, অসীমত্ব বা চিরন্তনত্ব কি; এমন কি আমরা জানি না, জীবন কি। লোকোত্তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সমস্যার ক্ষেত্রে সেই কারণেই আমাদের প্রয়োজন এমন কোনো পথের দিশারীর, যাঁর মনে আমাদের সবার মধ্যে বিরাজমান সাধারণ যুক্তিক্ষমতা ও কল্পনা – প্রধান যুক্তিবাদের চাইতে বেশী কিছু রয়েছে। এমন কাউকেও আমাদের প্রয়োজন, যিনি প্রেরণা লাভ করেছেন-এক কথায় আমরা তাঁকে বলতে পারি একজন রাসূল (Prophet) আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, কুরআন শরীফ আল্লাহর বাণী এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁরই প্রেরিত নবী, তা' হলে আমরা কেবল নৈতিক দিক দিয়ে নয়, বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়েও তাঁর নির্দেশ অন্ধভাবে অনুসরণ করতে বাধ্য।

www.pathagar.com

''অন্ধভাবে'' কথাটিতে একথা বুঝায় না যে, আমরা আমাদের সব রকম যুক্তিক্ষমতা বর্জন করবো। পক্ষান্তরে, আমাদের সামর্থ্য ও জ্ঞানের সর্বাধিক প্রয়োগ করেই আমাদেরকে সে ক্ষমতার ব্যবহার করতে হবে; হযরত রাসূলে করীম (সঃ) কর্তৃক আনীত আদেশের মৌলিক তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যে উদ্ভাবনের চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে। কিন্তু আমরা তার সঠিক উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হই অথবা –নাই হই, আমাদের সে আদেশ মেনে চলতেই হবে। এখানে আমি এক সৈনিকের দৃষ্টান্ত পেশ করতে চাই, যে সেনাপতি কর্তৃক একটি বিশেষ সামরিক অবস্থান অধিকার করতে আদিষ্ট হয়েছে। কর্তব্যনিষ্ঠ সৈনিক অবিলম্বে সে আদেশ পালন ও কার্যকারী করবে। কাজের সময়ে যদি সে সেনাপতির দৃষ্টিভংগিতে আদেশের ভিতরকার সামরিক উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে, তা' তার নিজের জীবনের পক্ষে কল্যাণকর; কিন্তু সেনাপতির আদেশের গভীরতর লক্ষ্য যদি তার কাছে তখন ধরা না পড়ে, তা হলেও সে সেই নির্দেশিত অবস্থান ত্যাগের বা আদেশ কার্যকরী করা স্থগিত রাখার অধিকারী নয়। আমরা মুসলিমরা মানব–জাতির সর্বোত্তম সেনানায়ক হিসাবে হযরত রাসূলে করমী (সঃ) এর উপর নির্ভর করি। স্বাভাবিকভাবেই আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে আত্মিক ও সামাজিক উভয় দিকই আমাদের চাইতে বহুগুণে ভালো জানাতেন। এটা করবার বা ওটা বর্জন করবার আদেশ দেওয়ার মধ্যে তাঁর এমন একটা 'সামরিক' লক্ষ্য ছিলো, যাকে তিনি মানুষের আত্মিক বা সামাজিক কল্যাণের জন্য অপরিহার্য মনে করতেন। কখনো এ উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট দৃশ্যমান, কখনো বা সাধারণ মানুষের অশিক্ষিত চোখের কাছে তা' কম–বেশী গোপন থাকে; কখনো আমরা বুঝতে পারি রাসূলে করীম (সঃ)–এর আদেশের গভীরতম লক্ষ, আবার কখনো বা বুঝি কেবল তার কৃত্রিম অব্যবহিত উদ্দেশ্য। অবস্থা যাই হউক রাসূলে করীমের আদেশ পালন করতে আমরা বাধ্য, যদি তাদের নির্ভরযোগ্যতা সংগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। অপর কিছুতে কিছু এসে যায় না।

www.pathagar.com

অবশ্যি রাসূলে করীমের কোনো কোনো আদেশ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আবার কোনো কোনো আদেশ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরকে কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে উপর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে প্রাধান্য দিতে হবে। কিন্তু কোনো আদেশ আমাদের কাছে অপরিহার্য মনে না হলেই তাকে কোনো করার অধিকার আমাদের নেই; কারণ কুরআন শরীফে রাসূলে করীম (সঃ) এর সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ـ

"তিনি নিজের খুশী মোতাবেক কথা বলনে না"। (সূরা ৫৩ঃ ৮)

অর্থাৎ তিনি কথা বলেন কেবল প্রয়োজনের উদ্ভব হলে এবং তাও তিনি বলেন আল্লাহর হুকুম মোতাবেক। এই কারণেই ইসলামী ভাবধারার সত্যিকার অনুসারী হতে চাইলে আমরা প্রাণবস্তু ও রূপের (Spirit and form) দিক দিয়ে হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এর সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করতে বাধ্য।

একবার কোনো মুসলিমের পক্ষে তার রাসূলের সুন্নাহ্ অনুসরণের তন্ময় প্রয়োজনীয়তা (objiective necessity) প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ইসলামের ধর্মীয় সামাজিক কাঠামোয় তার ভূমিকা অনুসন্ধানের অধিকার তার আছেঃ এমন কি, তা' তার কর্তব্য বলেই ধরা যেতে পারে। যে বিরাট বিস্তারিত আইন-পদ্ধতি ও আচরণ-বিধি জন্ম থেকে মৃত্যুর মুহূর্তে মুসলিম জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে তার আচরণকে তার অস্তিত্বের সর্বাধিক জরুরী থেকে শুরু করে তুচ্ছতম পর্যায়ে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে বলে মনে করা হয়, তার আত্মিক তাৎপর্য কি? অথবা সম্ভবতঃ এর কি কোনো মানেই নেই? রাসূলে করীম যে তার অনুগামীদেরকে প্রত্যেকটি কার্য তাঁরই মতো করতে আদেশ করেছেন এর মধ্যেও কি কোনো কল্যাণ রয়েছে? উভয় হস্তই যদি সমভাবে পরিচ্ছন্ন থাকে, তা হলো ডান হাত বা বাম হাত যে হাত দিয়েই খাই না কেন, তাতে এমন কি পার্থক্য হতে পারে? আমি দাঁড়ি রাখি বা

www.pathagar.com

কামিয়ে ফেলি, তাতে এমন কি পার্থক্য? এসব কার্যগুলো কি নিছক আনুষ্ঠানিক নয়? মানুষের অগ্রগতির বা সমাজের কল্যাণের সাথে এ সব কাজের কি এমন সম্পর্ক? আর তা' যদি না-ই থাকে, কেন আমাদের উপর এগুলো চাপানো হল?

আমরা যারা বিশ্বাস করি যে, সুন্নাহ পালনের মধ্যে ইসলামের উত্থান-পতন নিহিত, তাদের পক্ষে এ সব প্রশ্নের জওয়াব দেবার সময় অনেক আগেই এসে গেছে।

আমার জ্ঞান মতো সুন্নাহ প্রবর্তনের পক্ষে অন্ততঃ তিনটি সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে।

প্রথম কারণ হচ্ছে, স্থায়ীভাবে মানুষকে সচেতন, সজাগ ও আত্ম-নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ধারাবাহিক জীবন-যাপনের শিক্ষা দান। মানুষের আত্মিক অগ্রগতির পথে বিশৃংখল কার্যকলাপ ও অভ্যাস বাধা সৃষ্টি করে। এ সব দোষ যথাসম্ভব দূর করতে হবে, কারণ এ সব দোষ আত্মিক একাগ্রতা বিনষ্ট করে। যা' কিছু আমরা করি তা;' আমাদের ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণের অধীন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্য আমাদের আত্ম-পর্যবেক্ষণেরও দরকার। একজন মুসলিমের পক্ষে এই স্থায়ী আত্ম-সংযমের প্রয়োজন সুন্দররূপে বর্ণণা করেছেন হযরত ওমর বিন আল্ খাত্তাব (রাঃ)-

حَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا ـ

"হিসাব দেবার জন্য আহূত হবার আগে তোমরা নিজেদের কাছে হিসাব দাও।" রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেনঃ

اُعْبُدْ رَبَّكَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ ـ

"তোমার প্রভুর এবাদাত কর, যেনো তুমি তাঁকে দেখেছো।"[৪]

আগেই বলা হয়েছে যে, ইসলামী এবাদাতের ধারণা কেবল কঠোরভাবে ভক্তিমূলক কর্তব্য পালনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আমাদের

৪. সহীহ্-আল্ বুখারী, সহীহ মুসলিম সুনান আবি দাউদ, সুনান আন্ নাসায়ী।

www.pathagar.com

সমগ্র জীবন তার আওতার মধ্যে আসে। আমাদের আত্মিক ও আমাদের বস্তুবাদী সত্তাকে অখন্ড সত্তার বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করাই-এর লক্ষ্য। সুতরাং মানবীয় সম্ভাবনা অনুযায়ী যথাসম্ভব আমাদের জীবনে অচেতন ও অনিয়ন্ত্রিত দিকেই দূবীভূত করার দিকে আমাদের প্রচেষ্টাকে স্পষ্টভাবে চালিত করতে হবে। এ পথের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে আত্মপর্যবেক্ষণঃ ব্যক্তি বিশেষের নিজকে আত্মপর্যবেক্ষণের শিক্ষাদানের নিশ্চিতম পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অভ্যস্ত আপাতঃ মামূলী কার্যকল্যাপকেও সংযমের অধীন করে তোলা। আমাদের আলোচ্য মানসিক শিক্ষার দিক দিয়ে সে সব ছোটখাটো জিনিস, সে সব মামুলী কার্যকলাপ ও অভ্যাস প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনের মহৎ কার্যাবলীর চাইতে বহুগুণে স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান। সুতরাং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা' থাকে আমাদের চেতনার সীমানার মধ্যে। কিন্তু অন্যান্য ছোটখাটো জিনিষ সহজেই আমাদের মনোযোগ এড়িযে সংযমে সীমানার বাইরে চলে যায়। সুতরাং এই সব জিনিসই হচ্ছে বহু গুণে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যার উপর আমরা আমাদের আত্মসংযম-ক্ষমতাকে তীক্ষ্নতর করতে পারি।

আমরা কোন হাত দিয়ে খাই, আমরা দাঁড়ি কামিয়ে ফেলি বা রেখে দেই, এ সব কার্যগুলি নিজেরা তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়তো না-ও হতে পারে; কিন্তু সর্বদা ধারাবাহিক সংকল্প নিয়ে কাজ করার উচ্চতম মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে; কারণ, এই ধরণের কাজের মাধ্যেমেই আমরা নিজেদেরকে আত্মপর্যবেক্ষণ ও নৈতিক সংযমের উচ্চ স্তরে তুলতে পারি। এটা খুব সহজ কাজ নয়; কারণ মানসিক অলসতা দৈহিক অলসতা অপেক্ষা মোটেই কম বাস্তব নয়। যদি আপনি বসে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত কোন লোককে দূর পথ হেটে যেতে আদেশ করেন, সে শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে চলতে অক্ষম হয়ে পড়বে। কিন্তু যে, লোক বরাবরই হাঁটা-চলায় সারা জীবন কাটানোর শিক্ষা গ্রহণ করেছে, তার অবস্থা তেমন হয় না। তার পক্ষে এই ধরনের পেশী খাটানোর কার্য মোটেই

www.pathagar.com

ক্লান্তিকর নয়; বরং তা' হচ্ছে তার পক্ষে অভ্যস্ত আনন্দদায়ক দৈনিক পরিশ্রমের কাজ। সুন্নাহ্ কেন মানব জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করবে– তার পক্ষে এটা হচ্ছে আর একটি যুক্তি। যদি আমরা আমাদের সর্বাধিক কার্যকলাপ ও ত্রুটিকে সব সময়ে সচেতনভাবে বিচার করতে আদিষ্ট হই, তা হলো আমাদের আত্মপর্যবেক্ষণের ক্ষমতা ক্রমাগত বেড়ে চলে এবং কালক্রমে আমাদের দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হয়। যতোদিন এই শিক্ষা চলতে থাকে, ততোদিন ধরে এর সাথে সাথে প্রত্যহ আমাদের নৈতিক অলসতা হ্রাস পেতে থাকে।

'শিক্ষা' কথাটির প্রয়োগে স্বাভাবিকভাবেই বুঝায় যে, তার ফল কার্যে সম্পাদন সংক্রান্ত চেতনার ওপর নির্ভর করে। সুন্নাহ্ পালনের অভ্যাস যে মুহূর্তে দৈনন্দিন যান্ত্রিক ধরাবাঁধা কার্যকলাপের পর্যায়ে নেমে যায়, তখনই তার শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্য সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। গত কয়েক শতক ধরে মুসলিমদের অবস্থা হয়েছে তাই। রাসূলে করীম (সঃ) এর সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের কয়েক পুরুষের লোকেরা যখন রাসূলে খোদার দৃষ্টান্তের সাথে তাদের অস্তিত্বের খুটিনাটি সব কিছুর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাঁরা তা' করেছিলেন কুরআনের ভাবধারা অনুযায়ী জীবন গঠনের নির্দেশমূলক ইচ্ছার কাছে সচেতন আত্ম–সমর্পনের মনোভাব নিয়ে। এই সচেতন সংকল্পের দরুন সুন্নাহ্র শিক্ষায় তাঁর পূর্ণ কল্যাণ লাভ করেছিলেন। এই ধারা যে মনস্তাত্ত্বিক পন্থা উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলো, পরবর্তী কালের মুসলিমরা তার সঠিক প্রয়োগ না করে থাকলে তার জন্য সে ধারাকে দোষ দেয়া যায় না। এ ত্রুটির কারণ সম্ভবতঃ বিশেষ করে সুফিবাদের প্রভাব, যা' কমবেশী মানুষের সক্রিয় উদ্যমকে উপেক্ষা করেছে এবং তার নিছক ধারণক্ষম উদ্যমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামের শুরু থেকে সুন্নাহ্ ইসলামী ধর্মীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ব'লে সুফিবাদ নীতি হিসাবে তার মূলোচ্ছেদ করতে পারেনি। কিন্তু সে তার সক্রিয় উদ্যম ও কতক পরিমাণে তার উপযোগিতা বিনষ্ট করতে সক্ষম

www.pathagar.com

হয়েছে। সুন্নাহ্ সুফীদের কাছে হয়ে আছে ভাববাদী পটভূমিকার ওপর নিষ্ক্রিয় প্রেটোবাদী গুরুত্বসম্পন্ন আদর্শ; ধর্মবেত্তাও বিধানকর্তাদের কাছে বিধান-পদ্ধতি আর মুসলিম জনতার কাছে জীবন্ত অর্থবিবর্জিত শূন্যগর্ভ ঝিনুকের মত। কিন্তু কুরআন পাকের শিক্ষা ও সুন্নাতে রাসূলের মারফতে তাঁর ব্যাখ্যা থেকে কল্যাণ লাভে মুসলিমদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও সে শিক্ষার অন্তর্নিহিত ধারণা ও তার ব্যাখ্যা এখনো অবিকৃত রয়েছে এবং তাকে যে আবার বাস্তবে রূপ দেওয়া যাবে না, এমন কোনো কারণ নেই। আমাদের বিরোধী সমালোচকদের অনুমান অনুযায়ী সুন্নাহর আসল উদ্দেশ্য 'ফ্যারিসী'[৫] ও শুষ্ক অনুষ্ঠান প্রিয় মানুষ তৈরী নয়, বরং সচেতন, দৃঢ়সংকল্প ও গভীরমনা কর্মপ্রবণ মানুষ তৈরী করা। রাসূলে করীমের সাহাবারা ছিলেন এই ধরণের নর-নারী। তাঁরা যা' কিছু করেছেন, তাতে ছিলো তাঁদের স্থায়ী সচেতনতা, ভিতরের সজাগ মন ও দায়িত্ববোধ; এরই ভিতর রয়েছে তাঁদের রহস্যজনক যোগ্যতা ও চমকপ্রদ ঐতিহাসিক সাফল্যের মূল।

এই হচ্ছে সুন্নাহর প্রথমও বলতে গেলে এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে সামাজিক গুরুত্ব ও উপযোগিতা। মানুষের পারস্পরিক কার্যকলাপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল ধারণার দরুনই যে বেশীর ভাগ সামাজিক সংঘাতের জন্ম হয়েছে, সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে না। এই ধরণের ভুল ধারণার কারণ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির প্রবণতা ও আকাংখার মধ্যে চরম বৈষম্য। তারপর বিভিন্ন প্রবণতা মানুষের ওপর বিভিন্ন স্বভাব চাপিয়ে দেয় এবং বহু বছরের আচরণের ফলে সেই বিভিন্ন স্বভাব কঠিন হয়ে মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তোলে। পক্ষান্তরে, যদি কতিপয় ব্যক্তির স্বভাব জীবনভর অভিন্ন থাকে, সে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সম্পর্ক সহানুভূতিপূর্ণ হবার সকল সম্ভাবনা থাকে এবং তাদের মনেও পরস্পরকে উপলব্ধি করার প্রস্তুতি থাকে। ইসলাম মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত কল্যাণ সম্পর্কে সমভাবে উৎসাহী বলেই তার অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে, সমাজের সকল

৫. ইহুদী ধর্মের পুরোহিত সম্প্রদায়

www.pathagar.com

মানুষকে তাদের অভ্যাস ও রীতিনীতির দিক দিয়ে পরস্পরের অনুরূপ করে তুলবার প্রেরণা দান করতে হবে, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা যতোই বিভিন্ন হোক না কেন।

কিন্তু এ ছাড়া সুন্নাহ তার তথাকথিত কঠোরতার মধ্য দিয়ে সমাজের আরো বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করছে, বহিরাচরণের দিক দিয়ে তাকে সুসংবদ্ধ ও মযবুত করে তুলছে এবং 'সামাজিক প্রশ্নের' নামে দুশমনীও সংঘাত সৃষ্ট হয়ে পাশ্চাত্য সমাজে যে বিভ্রান্তিকর অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে, ইসলাম সেরূপ পরিস্থিতির সম্ভাবনা রোধ করছে। এই ধরনের সামাজিক প্রশ্নের উদ্ভব তখনই হয়, যখন কোনো বিশেষ অনুশাসন বা রীতি অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিবহুল বলে অনুভূত হয় এবং তার সমালোচনা ও ক্রমাগত পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু মুসলিমদের–যারা নিজেদেরকে কুরআনের কানুন ও তারপরেই রাসূলে (সঃ)–এর প্রদত্ত অনুশাসন দ্বারা চালিত মনে করে, তাদের কাছে সামাজিক অবস্থার একটা সুনির্দিষ্ট রূপ থাকবে; কারণ তারা এ সংক্রান্ত বিধি–বিধানসমূহকে মনে করে লোকোত্তর মূল থেকে উদ্ভূত। যতদিন এই মূল সম্পর্কে কোনো সন্দেহের উদ্ভব না হবে, ততদিন মৌলিক দিক দিয়ে সমাজ–সংগঠন সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়োজন ও আকাংখা অনুভূত হবে না। কেবল এ ভাবেই আমরা কুরআনের নির্দেশের এই বাস্তব সম্ভাবনার ধারণা করতে পারি যে, মুসলিমরা হবে এক মযবুত সৌধের মতো। আমাদের জাতীয় জীবনে যদি আমরা এই নীতি প্রয়োগ করে চলি, তা' হলে কোনো আংশিক সমস্যা ও আংশিক 'সংস্কারে; আমাদের সামাজিক উদ্যম ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। তখন প্রকৃতি বিবেচনায় তাদের কেবল সাময়িক মূল্যই থাকতে পারে। দ্বান্দ্বিক বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত এবং খোদায়ী কানুন ও আমাদের রাসূলের জীবনাদর্শের মযবুত ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা ইসলামী সমাজ তার সকল শক্তি প্রকৃত বস্তুবাদী ও বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত কল্যাণের কাজে লাগাতে

www.pathagar.com

পারে এবং তার ফলে ব্যক্তির আত্মিক প্রচেষ্টার পথও মুক্ত হতে পারে। ইসলামী সমাজ সংগঠনের প্রকৃত ধর্মীয় লক্ষ্য এ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর পর আমরা আসবো সুন্নাহ্‌র তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ও তা' কঠোরভাবে অনুসরণের প্রয়োজনের প্রসংগ আলোচনার দিকে।

এই ধারায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বহু খুটিনাটি ব্যাপারই রাসূল করীমের (সঃ) উপস্থাপিত আদর্শের ভিত্তিযুক্ত। তাই এ ক্ষেত্রে যা কিছু আমরা করি, রাসূলে করীমের কার্য বা বাণী সম্পর্কে চিন্তা করতে আমরা স্থায়ীভাবে বাধ্য হই। এমনি করে শ্রেষ্ঠ মানবের ব্যক্তিত্ব আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খুটিনাটি কাযকর্মে প্রতিফলিত হয় এবং তাঁর আত্মিক প্রভাব আমাদের অস্তিত্বের বাস্তব পুনরাবৃত্তিশীল উপাদানে পরিণত হয়। সচেতন বা অবচেতনভাবে আমরা যে কোনো ব্যাপারে রাসূলে করীম (সঃ)-এর মনোভাব জানবার দিকে চালিত হই; তাঁকে আমরা গ্রহণ করতে শিখি কেবল আল্লাহ্‌র প্রেরিত নৈতিক নির্দেশের বাহক হিসাবে নয়, বরং পরিপূর্ণ জীবনের পথ নির্দেশক হিসাবেও। এখানেই আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হবে-রাসূলকে আমরা গ্রহণ করতে চাই দুনিয়ার বহু বিজ্ঞ মানুষের অন্যতম বলে, না খোদায়ী প্রেরণা-লব্ধ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নবী বলে। এ ব্যাপারে কুরআনে মজীদের মতবাদ কোনোরূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির সম্ভাবনার উর্ধে সুস্পষ্ট। যে মানুষটি আল্লাহ্‌র শেষ নবী ও 'বিশ্বজগতের প্রতি করুণা' রূপে প্রেরিত, তিনি স্থায়ীভাবে খোদায়ী প্রেরণার অধিকারী না হয়ে পারেন না। তাঁর নির্দেশ বা নির্দেশের অংশ বিশেষ অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করা। ন্যায়শাস্ত্র সংগতভাবে বিচার করলে এ চিন্তা-ধারার আরো একটি অর্থ হতে পারে এই যে, ইসলামের সম্পূর্ণ পয়গাম মানুষের সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে আসেনি, এসেছে মাত্র বিকল্প সমাধান হিসাবে; এবং এহ সমাধান অথবা অন্যবিধ সম্ভবতঃ সমভাবে সত্য ও উপযোগী সমাধান গ্রহণ যা আমাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নৈতিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে মোটেই বাধ্যতামূলক নয় বলেই এই সহজ নীতি আমাদেরকে

www.pathagar.com

অপর যে কোনো দিকে চালিত করতে পারে, কিন্তু তা নিশ্চয়ই ইসলামী ভাবধারার পথে চালিত করবে না। কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

''আজ আমি তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করেছি তোমাদের ধর্মকে এবং পরিপূর্ণ করেছি তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত এবং মনোনীত করেছি ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে।"

ইসলামকে আমরা অন্যবিধ সর্বপ্রকার ধর্মীয় পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করি; কারণ, ইসলাম জীবনের সমগ্র দিকের ওপর পরিব্যাপ্ত। সে দুনিয়া ও আখেরাত, আত্মা ও দেহ, ব্যক্তি ও সমাজের সকল দিক সমভাবে বিবেচনা করেছে। সে কেবল মানব-প্রকৃতির উচ্চ সম্ভাবনাই বিবেচনা করেনি, বরং তার মৌলিক বাধা ও দুর্বলতাও বিবেচনা করেছে। ইসলাম কোনো অসম্ভবকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয় না, বরং আমাদের সকল সম্ভাবনার সর্বোত্তম প্রয়োগের পথে চালিত করে আমাদেরকে বাস্তবতার এমন এক উচ্চতর পর্যায়ে পৌছে দিবার সহায়তা করে, যেখানে ধারণা ও কর্মের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই, বিরোধ নেই। এ অসংখ্য পথের একটি নয়, বরং এ হচ্ছে একমাত্র পথ; এবং যে মানুষটি আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তিনি বহু রাহ্‌বরের অন্যতম নন, বরং একমাত্র রাহ্‌বর। তাঁর কার্যকলাপ ও আদেশের অনুসরণ করার অর্থ ইসলামের অনুসরণ করা; তাঁর সুন্নাহ্‌কে বাতিল করা ইসলামের বাস্তবতাকে বাতিল করারই সমর্থক।

www.pathagar.com

উপসংহার

আগেই আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, সত্যিকার তাৎপর্যের দিক দিয়ে ইসলাম পশ্চিমী সভ্যতাকে আত্মস্থ করে উপকৃত হতে পারে না। বরং পক্ষান্তরে, মুসলিম জাহানে আজকের দিনে এত অল্প উদ্যম অবশিষ্ট রয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে সে যথেষ্ট প্রতিরোধ দাঁড় করাতে পারছে না। তার সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের ভগ্নাবশেষ সর্বত্রই পাশ্চাত্য ধারণা ও রীতির চাপে ধূলিলুণ্ঠিত হচ্ছে। আত্মসমর্পণের নতুন আওয়াজ শোনো যাচ্ছে; জাতি ও সংস্কৃতির জীবনে এ আত্মসমর্পণ মৃত্যুরই নামান্তর।

ইসলামের অবস্থা আজ কোথায় দাঁড়িয়েছে? আমাদের বিরোধীরা এবং আমাদেরই মধ্যে পরাজিত মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকেরা আমাদেরকে যা' বিশ্বাস করাতে চাচ্ছেন, ইসলাম কি তেম্‌নি এক 'ক্ষয়িত শক্তি'? সত্যিই কি ইসলাম তার উপযোগিতা হারিয়েছে এবং দুনিয়াকে তার যা' দিবার ছিলো, দিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে?

ইতিহাস আমাদেরকে বলে যে, সকল মানবীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা হচ্ছে জৈব এবং তাতে জীবন্ত সত্তারই প্রতিফলন হয়। জৈব জীবন যে সব পর্যায় অতিক্রম করতে বাধ্য হয়, তাদেরকেও সে-সব পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। তারাও জন্ম লাভ করে; তাদেরও যৌবন, বার্ধক্য ও অবশেষে মৃত্যু আছে। চারাগাছ যেমন করে শুকিয়ে ধূলিলুণ্ঠিত হয়, সাংস্কৃতিরও সময়ের অবসানে আসে মৃত্যু এবং সে-ও স্থান ছেড়ে দেয় নবজাত সংস্কৃতির জন্য।

ইসলামের ক্ষেত্রেও কি তাই ঘটেছে? প্রথম কৃত্রিম দৃষ্টিতে সেরূপ মনে হবে। নিঃসন্দেহে ইসলামী সংস্কৃতির গৌরবময় উত্থান ঘটেছিলো। তারও ছিলো এক স্ফুরণের যুগ, তারও শক্তি ছিলো মানুষকে কর্মে ও

www.pathagar.com

ত্যাগে প্রেরণা দেবার, সে-ও জাতিসমূহকে নবতররূপ দান করেছে এবং পরিবর্তন এনেছে দুনিয়ার চেহারায়; পরে সে দাঁড়িয়ে গেছে নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল হয়ে, তারপর পরিণত হয়েছে শূন্যগর্ভ কথায় এবং বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার অবমাননা ও পতন। কিন্তু এই কি সব কিছু?

যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলাম বহু সংস্কৃতির অন্যতমই নয়, মানবীয় চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টার পরিণামই নয়, বরং সর্বযুগে সর্বত্র মানবতার অনুসরণীয় সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশিত কানুন, তা' হলে তার বৈশিষ্ট্যে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। ইসলামী সংস্কৃতি যদি আমাদের আল্লাহর প্রেরিত কানুন অনুসরণেরই ফল হয় বা হয়ে থাকে, তা' হলে আমরা কখনো স্বীকার করতে পারি না যে, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথেই তার সংযোগ এবং তা কোনো বিশেষ যুগে সীমাবদ্ধ। ইসলামের পতন বলে যা মনে হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তা আমাদের অন্তরের মৃত্যু ও শূন্যতা ছাড়া কিছু নয়-আমাদের অন্তর আজ এমন অলস ও নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে যে, চিরন্তনের আহ্বান শুনতেই সে পাচ্ছে না বর্তমান পর্যায়ে মানব জাতি যে ইসলামের সীমানা ছাড়িয়ে উর্ধে ওঠে গেছে, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইসলাম যে নীতিবাদ আমাদেরকে দিয়েছে, তার চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু কেউ আজো পেশ করতে পারেনি; ইসলাম জাতীয়তার উর্ধে যে উম্মতের ধারণা এনে দিয়েছে, মানব-ভ্রাতৃত্বের বাস্তব রূপায়ণের তার চাইতে কোনো শ্রেষ্ঠ ধারণা আজও পাওয়া যায়নি; ইসলামের সামাজিক পরিকল্পনায় যেরূপ কার্যকরীভাবে পারস্পরিক সংঘাত ও বিরোধকে ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে, তেমন কোনো সামাজিক কাঠামো-তো কেউ আজও তৈরী করতে পারেনি; পারেনি মানুষের মর্যাদা বাড়াতে। অন্য কোনো ব্যবস্থাই আজও বৃদ্ধি করতে পারেনি তার নিরাপত্তাবোধ, তার আত্মিক আশা-আকাংখা ও সুখ-স্বচ্ছন্দ্য।

এ-সব দিক দিয়ে মানব-সমাজের বর্তমান কৃতিত্ব ইসলামী কার্যসূচীর বহু নীচেই পড়ে আছে। তা' হলে 'ইসলাম কালোপযোগী নয়'

www.pathagar.com

বলার যৌক্তিকতা কোথায়? এর কি একমাত্র কারণ এই যে, ইসলামের বুনিয়াদ নিছক ধর্মীয় এবং ধর্মীয় পুনর্গঠন আজকের দিনের ফ্যাশনের বিরোধী? কিন্তু যদি আমরা দেখি যে, কোনো ধর্মের ভিত্তিযুক্ত পদ্ধতি মানব-মনের সংস্কার ও প্রস্তাবের পথ ধরে উদ্ভাবিত যে-কোনো জিনিষের চাইতে অধিকতর সুসম্পূর্ণ, অধিকতর সুনির্দিষ্ট ও মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠনের পথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের কর্মসূচী এনে দিতে পারে, তাহলে কি সে ধর্মীয় দৃষ্টিভংগির পথে অতি মূল্যবান যুক্তি নয়?

আমাদের বিশ্বাস করবার সর্বপ্রকার সংগত কারণ রয়েছে যে, মানুষের অর্জিত নির্দিষ্ট কৃতিত্বই ইসলামের দাবী পূর্ণরূপে সমর্থন করেছে; কারণ তা অর্জিত হওয়ার দীর্ঘকাল আগেই ইসলাম তাদের সম্পর্কে চিন্তা করেছে ও নির্দেশ দিয়েছে। মানবীয় ক্রমবিকাশের ত্রুটি, ভুলভ্রান্তি ও বিচ্যুতি দ্বারা তা' সমভাবে সমর্থিত হয়েছে; কারণ মানুষ সে সব জিনিষকে ভুল বলে চিনবার দীর্ঘকাল আগেই ইসলাম তার স্বরে সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের সম্পর্কে হুশিয়ারী জানিয়েছে। ব্যক্তি বিশেষের ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়াও নিছক বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিভংগিতে রয়েছে ইসলামের বাস্তব নির্দেশ অনুসরণের সর্বপ্রকার প্রেরণা।

আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে স্বভাবতঃই আমাদেরকে সিদ্ধান্তে পৌছতে হয় যে, তার পূনর্জাগরণ সম্ভব। কোনো কোনো মুসলিমের ধারণা অনুযায়ী ইসলামের কোনো কল্পিত নীতির সংস্কার চেষ্টা না করে ধর্মের প্রতি আমাদের মনোভাব, আমাদের নিষ্ক্রিয়তা, আমাদের অহমিকা, আমাদের অদুরদর্শিতা-এক কথায়, আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির সংস্কার প্রয়োজন। ইসলামের পূনর্জাগণের জন্য বাইরে থেকে আমাদের কোনো নতুন আচরণ বিধির সন্ধান করার প্রয়োজন নেই, বরং আমাদেরকে সেই পুরাতন ও পরিত্যক্ত আচরণবিধি প্রয়োগ করতে হবে। বিদেশী সংস্কৃতি থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে নবতর প্রেরণা লাভ করতে পারি; কিন্তু

www.pathagar.com

ইসলামের পরিপূর্ণ কাঠামোর স্থলে ইসলাম বহির্ভূত কোনো কিছু আমরা আমদানী করতে পারি না–তা' পাশ্চাত্য প্রাচ্য যেখান থেকেই আসুক না কেন। আত্মিক ও সামাজিক বিধান হিসাবে ইসলামের কোনো 'উন্নতি বিধানের' অবকাশ নেই। এমতাবস্থায় বিদেশী সাংস্কৃতিক প্রভাবের অনুপ্রবেশের ফলে তার ধারনায় বা সমাজ–সংগঠনে কোনো পরিবর্তন সাধন প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদ্‌গতি–সূচক ও ধ্বংসাত্মক; সুতরাং তা' দুঃখজনকও বটে। পরিবর্তন তো আসবেই; কিন্তু সে পরিবর্তন হবে আমাদের নিজেদের ভিতরে এবং তার গতি হবে ইসলামের দিকে, তা' থেকে দূরে নয়।

কিন্তু এ–সব নিয়ে আমাদের আত্মপ্রতারণা করা চলবে না। আমরা জানি, আমাদের দুনিয়া–ইসলামী দুনিয়া–স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তা হিসাবে তার বাস্তবতা প্রায় হারিয়ে বসেছে। আমি এখানে মুসলমানদের পতনের রাজনৈতিক দিকের কথা বলছি না। আমাদের আজকের দিনের অবস্থার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক খুঁজে পাওয়া যাবে বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ও সামাজিক ক্ষেত্র, আমাদের ইমানের বিলুপ্তিতে ও আমাদের সমাজ সংগঠনের ভাঙনের মধ্যে। প্রাথমিক যুগের ইসলামী সমাজের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে যে মৌলিক সুষ্ঠুতা আমরা দেখেছি, তার অতি অল্পই অবশিষ্ট রয়েছে। আজকের দিনে আমরা যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিশৃংখলার ভিতর দিয়ে চলেছি, তা' স্পষ্ট প্রমাণ করেছে, একদা ভারসাম্য রক্ষার যে শক্তি ইসলামী দুনিয়ার মহত্ত্বের কারণ ছিলো, আজ তা' প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে। আমরা তাড়িত হচ্ছি, কেউ জানে না, কোন সাংস্কৃতিক পরিণামের দিকে। আমাদের ধর্ম ও সমাজের পক্ষে ধ্বংসকর বিদেশী প্রভাবের স্রোতধারা প্রতিরোধ করবার বা এড়িয়ে যাবার কোনো বুদ্ধিবৃত্তিগত সাহস নেই, ইচ্ছাও নেই। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নৈতিক শিক্ষাকে আমরা দূরে ঠেলে দিয়েছি। আমাদের ধর্মকে আমরা মিথ্যা প্রমাণ করছি, অথচ আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে তা' ছিলো জীবন্ত সত্য; তাঁরা যাতে গর্বিত হতেন, তাতে আমরা লজ্জিত; আমরা নীচ আত্মপূজারী, অথচ

www.pathagar.com

তাঁরা নিজেদের মহত্ত্বকে তুলে ধরেছিলেন দুনিয়ার সামনে; আমরা শূন্যগর্ভ, আর তাঁরা ছিলেন পূর্ণতার অধিকারী।

এ আফসোস প্রত্যেক চিন্তাশীল মুসলিমদের কাছে বহু পরিচিত। প্রত্যেকেই এর পুনরাবৃত্তি শুনেছেন বহুবার। প্রশ্ন ওঠতে পারে, এর আর একবার পুনরাবৃত্তিতে কোনো লাভ আছে কি? আমার মনে হয়, লাভ আছে। কারণ, আমাদের পতনের লজ্জা থেকে রেহাই পাবার একটি ব্যতীত আর কোনো পন্থা নেই; তা হচ্ছে সে লজ্জা স্বীকার করা, দিন-রাত তা' চোখের সামনে রাখা আর তার তিক্ততা আস্বাদন করা, যতোক্ষণ না আমরা তার কারণ দূর করতে কৃতসংকল্প হই। আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে এ নির্মম সত্যকে গোপন করায় যেমন লাভ নেই, তেমনি ইসলামী দুনিয়ায় ইসলামী কার্যকলাপ বাড়ছে, আমাদের মিশন চারটি মহাদেশে কাজ করে যাচ্ছে, পাশ্চাত্যের বাসিন্দারা ক্রমবর্ধিত মাত্রায় ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধি করছে বলে মিথ্যা ভান করায় কোনো লাভ নেই। এসব কথা বলে আত্মতৃপ্তি লাভের জন্য কূটযুক্তির অবতারণায় কোনো লাভ নেই। কারণ, সত্যি সত্যিই সে লজ্জা অন্তহীন।

কিন্তু এই-ই কি হবে শেষ পরিণতি?

তা' হতে পারে না। আমাদের পুনর্জাগরণের আকাংখা, বর্তমানের চাইতে ভালো কিছু করার জন্য আমাদের অনেকের ইচ্ছা আমাদের মধ্যে সংগত আশা জাগিয়ে দেয় যে, আমাদের দিন এখনো অতীত হয়ে যায়নি। পূনর্জাগরণের একটা পথ এখনো রয়েছে এবং পথ প্রত্যেকটি চক্ষুষ্মান লোকের কাছেই সুস্পষ্ট।

আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ইসলামের পক্ষে সেই কৈফিয়তের মনোভাব ঝেড়ে ফেলা, যার আরেক নাম হতে পারে বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত পরাজিত মনোবৃত্তি-আমাদের নিজস্ব সন্দেহবাদের ছদ্মরূপ। এর পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে আমাদের রাসূলে করীম (সঃ)-এর সুন্নাহ্‌র সচেতন ইচ্ছাকৃত অনুসরণ। কারণ, সুন্নাহ্ বলতে ইসলামী শিক্ষার বাস্তব রূপায়ণ

www.pathagar.com

ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে তার প্রয়োগ দ্বারা আমরা সহজেই বুঝতে পারবো, পশ্চিমী সভ্যতার কোন্ প্রেরণা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে, আর কোন্‌টি অগ্রাহ্য করতে হবে। বিদেশী বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত আদর্শের কাছে ইসলামকে নির্বিবাদে বলি দেওয়ার পরিবর্তে আমরা আর একবার ইসলামকে গ্রহণ করতে শিখবো সেই আদর্শ হিসাবে, যা' দিয়ে দুনিয়াকে বিচার করা যাবে।

এটা অবশ্যি সত্যি যে, ইসলামের বহু মৌলিক উদ্দেশ্যকে ভুল পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হচ্ছে অনুপযোগী অথচ সাধারণভাবে গৃহীত ব্যাখ্যার মাধ্যমে এবং যে সব মুসলিম নিজেরা মূল উৎসে ফিরে গিয়ে তাদের ধারণাকে নতুন করে গড়ে তুলতে অক্ষম, তাদেরকে ইসলাম ও ইসলামী বিষয় সম্পর্কে আংশিকভাবে বিকৃত চিত্রের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বর্তমানে 'গোড়াপন্থী' আখ্যায় আখ্যায়িত মুসলিমরা যে অবাস্তব পরিকল্পনাকে ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ বলে পেশ করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা' মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশের প্রাচীন নয়াপ্লেটোবাদী (Neo-Platonic) ন্যায়শাস্ত্রভিত্তিক চলতি ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়, যা' হিজরী দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে 'আধুনিক' বা সচল হতে পারে; কিন্তু বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত অনুপযোগী।। যে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত ব্যক্তি আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের জটিলতার সাথে সুপরিচিত নন, তিনি সাধারণতঃ সে-সব জীর্ণ কল্পিত ব্যাখ্যা ও ধারণাকে বিধানকর্তার সত্যিকার উদ্দেশ্য হিসাবে পেশ করতে অভ্যস্ত এবং তাদের অনুপযোগিতায় হতাশ হয়ে কখনো কখনো তিনি এমন সব বিষয় থেকে পশ্চাৎপদ হন, যাকে তিনি অনুমান করেন ইসলামের ধর্মসম্মত কানুন (শরিয়াহ্) বলে। এসব বিধান যাতে আর একবার মুসলিম জীবনের সৃষ্ঠিধর্মী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তারই জন্য মূল উৎস সম্পর্কিত আমাদের নিজস্ব উপলব্ধির আলোকে ইসলামী ধারণাসমূহ সম্বন্ধে আমাদের মূল্যবোধ

www.pathagar.com

নতুন করে গড়ে তুলতে হবে এবং বহু শতাব্দীর পুঞ্জীকৃত ও বর্তমানের অনুপযোগী চলতি ব্যাখ্যার ঘন জঞ্জাল থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলে হবে এক নতুন ফিকাহ্ শাস্ত্রের জন্ম, যা ইসলামের যুগল উৎস-কুরআন ও রাসূলে করীম (সঃ)-এর জীবনাদর্শের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য সম্পন্ন হবে এবং একই সময়ে জবাব দিবে বর্তমান জীবনের জটিল সমস্যাবলীর; ঠিক যেমন করে ফিকাহ্ শাস্ত্রের প্রচীনতর রূপ জবাব দিয়েছিলো আরাস্তুবাদী (Aristotelian) ও নয়া-প্লেটোবাদী (Neo-Platonic) দর্শন-প্রভাবিত যুগের জটিলতার এবং সেই প্রারম্ভিক যুগে প্রচলিত জীবন সমস্যার।

কিন্তু আমরা আবার যদি আমাদের হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই তা' হলেই আমরা আশা করতে পারবো পুনর্বার উর্ধমুখে উত্থানের। আমাদের নিজস্ব সামাজিক অনুশাসনকে ধ্বংস করে এবং কোনো বিদেশী-কেবল ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিদেশী নয়, আত্মিক দিক দিয়েও বিদেশী সভ্যতার অনুকরণ করে আমরা কখনো আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌছাতে পারবো না।

আজকের দিনের যা অবস্থা তা'তে ইসলাম একটি নিমজ্জমান জাহাজেরই মতো। যারা তাকে সাহায্য করতে পারে, তাদেরকে অবিলম্বে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু যদি মুসলিমরা কুরআন পাকের এই আহ্বান শোনেন ও উপলব্ধি করেন, তবেই তার পরিত্রাণ সম্ভব হবেঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ-

'নিশ্চই রাসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ, যাদের দৃষ্টি আল্লাহ ও রোয কিয়ামতের প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে।' (সূরা ৩৩ঃ ২১)

—ঃ(সমাপ্ত)ঃ—

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

www.pathagar.com